الوصية الكبرى

মহা উপদেশ

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ

الوصية الكبرى

আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা

(মহা উপদেশ)

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া
রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদক: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ:

পরিচ্ছেদ:

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ)

এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সত্য দীনসহ যুগে যুগে অগণিত নাবী রসূল প্রেরণ করেছেন। নির্ভেজাল তাওহীদই ছিল নাবী-রসূলদের দীনের মূল বিষয়। পৃথিবীর মানুষেরা এই তাওহীদকে যখনই ভুলে গেছে, তখনই তা পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন নতুন নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আগমন করেন সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াতের মূল বিষয়ও ছিল এই তাওহীদ। মক্কায় অবস্থান করে একটানা ১৩ বছর তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করে তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণ তার এই দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং তারা তার সাহায্য করলো। আল্লাহ তা'আলা অল্প সময়ের মধ্যেই তার দীনকে বিজয়ী করলেন। আরব উপদ্বীপসহ পৃথিবীর সর্বত্রই এই দীনের দাওয়াত পৌঁছে গেল। তাওহীদের মাধ্যমে তারা সমগ্র জাতির উপর যে গৌরব, সম্মান, শক্তি, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিমদের শক্তির মূলভিত্তি এই নির্ভেজাল তাওহীদের উপর শিরক ও কুসংস্কারের আবর্জনা পড়ে যাওয়াই মুসলিমদের বিপর্যয়ের প্রধান ও মূল কারণ।

ইসলামের এই মূলভিত্তি নির্ভেজাল তাওহীদ থেকে যখনই মুসলিম জাতি দূরে চলে গেছে, দীনি লেবাসে বিভিন্ন সময় শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় আচার-আচরণ মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তখনই নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে জাতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল প্রকার আবর্জনা থেকে তাওহীদকে পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার জন্য ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে আল্লাহ তা'আলা বহু মর্দে মুজাহিদ প্রেরণ করেছেন। তারা পথহারা জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে এনেছেন, তাওহীদের দাওয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং দীনকে সকল প্রকার শিরক-বিদ'আত থেকে সংস্কার ও সংশোধন করেছেন। তাদেরই ধারাবাহিকতায় হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতকে আগমন করেন বিপ্লবী সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ)। বহু প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এবং জেল-যুলুম সহ্য করে তাওহীদ পুনরুদ্ধার ও সংস্কারে তিনি যে অতুলনীয় অবদান ও খেদমত রেখে গেছেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য তা দিশারী হয়ে থাকবে। তার বরকতময় জীবনী, দাওয়াত ও সংস্কারের সকল দিক উল্লেখ করতে গেলে বড় মাপের একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার। তাই আমরা স্বল্প পরিসরে শাইখের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, জীবনী ও সংস্কার আন্দোলনের কিছু দিক এখানে উল্লেখ করেছি।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়

তিনি হলেন আবুল আব্বাস তকীউদ্দীন শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ)। ৬৬১ হিজরী সালের ১০ রবীউল আওয়াল মাসে তিনি বর্তমান সিরিয়ার হারান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এবং দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফিকাহবিদ ছিলেন। সে হিসাবে তিনি এমন একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যার সকল সদস্যই ছিলেন আলিম ও দীনদার। আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে শিশুকালেই তিনি ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য যে, আলিমদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তাইমীয়া (রহিমাহাল্লাহ) ছিলেন শাইখের নানী। তিনি ওয়াজ-নাসীহত ও ভাষণ-বক্তৃতা দানে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

ইমামের বয়স যখন সাত বছর, তখন মুসলিম অঞ্চলগুলো তাতারীদের আক্রমণের শিকার হয়। শাইখের জন্মস্থান হারান এলাকা তাতারীদের আক্রমণের কবলে পড়লে মানুষ জানের ভয়ে সবকিছু পানির দামে বিক্রি করে পালাচ্ছিল। এই ভীতি ও আতঙ্কের দিনে ইমামের পরিবারবর্গ ও দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তারা প্রয়োজনীয় সবকিছু ফেলে দিয়ে শুধু পারিবারিক লাইব্রেরীর বই-পুস্তকগুলো গাড়ী বোঝাই করলেন। শুধু কিতাবেই কয়েকটি গাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। গাড়ীগুলো টানার জন্য প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও গাধাও ছিলনা। তাই গাধার পাশাপাশি পরিবারের যুবক সদস্যদেরও মাঝে মাঝে কিতাবের গাড়ী টানতে হতো। দামেস্কে পৌঁছার পর তথাকার লোকেরা শাইখের পরিবারকে অভ্যর্থনা জানালো। দামেস্কবাসীরা শাইখের পিতা ও দাদার জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতির কথা আগে থেকেই অবহিত ছিল। পিতা আব্দুল হালীম দামেস্কের বড় মসজিদ জামে উমুবীতে দারস দেয়ার দায়িত্ব লাভ করলেন। শীঘ্রই তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিশোর ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে হাদীছ, ফিক্হ ও আরবী ভাষা চর্চায় মশগুল হলেন। সেই সাথে তিনি পিতার সাথে বিভিন্ন ইলমী মজলিসে শরীক হতে লাগলেন।

ইমামের মেধা ও স্মরণশক্তি

ইমামের খান্দানের সবাই মেধাবী ছিলেন। কিন্তু তাদের তুলনায় ইমামের স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। শিশুকাল থেকে তার অসাধারণ স্মরণশক্তি শিক্ষকদের অবাক করে দিয়েছিল। দামেস্কের লোকদের মুখে মুখে তার স্মরণশক্তির কথা আলোচনা হতো। একদা আলেপ্পো নগরীর একজন বিখ্যাত আলেম দামেস্কে আসেন। তিনি কিশোর ইবনে তাইমীয়ার স্মরণশক্তির কথা লোকমুখে আগেই শুনেছিলেন। ইমামের স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি দর্জির দোকানে বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একদল ছেলেকে আসতে দেখা গেলো। দর্জি ইঙ্গিতের মাধ্যমে ইমামকে দেখিয়ে দিল। তিনি ইমামকে ডাকলেন। ইমামের খাতায় হাদীছের তের-চৌদ্দটি মতন লিখে দিয়ে বললেন, পড়ো। কিশোর ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) গভীর মনোযোগের সাথে হাদীছগুলো একবার পড়লেন। তিনি এবার খাতা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, মুখস্থ শুনিয়ে দাও। ইবনে তাইমীয়া তা মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। এবার একগাদা সনদ লিখে দিয়ে পড়তে বললেন। পড়া হলে মুখস্থ বলতে বললেন। ইমাম সনদগুলোও মুখস্থ বললেন। শাইখ এতে অবাক হয়ে বললেন, বড় হয়ে এই ছেলে অসাধ্য সাধন করবে।

ইমামের জ্ঞান অর্জন ও চর্চা

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) মাত্র সাত বছর বয়সে শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে তার জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ করে তুলেন। কুরআন, হাদীছ, ফিকহ এবং উসূলের সাথে সাথে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি দুই শতাধিক উস্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। কুরআনের তাফসীরের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। যে সব উস্তাদদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে ইবনে কুদামা, ইবনে আসাকেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটানা সাত থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত জ্ঞান লাভের পর শিক্ষকতা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাইশ বছর বয়সে উপনীত হলে তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া মৃত্যু বরণ করেন। তার পিতা ছিলেন দামেস্কের সর্ববৃহৎ দারুল হাদীছের প্রধান মুহাদ্দিস। আব্দুল হালীমের মৃত্যুর পর এই পদটি শূন্য হয়ে যায়। সুযোগ্য পুত্র ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) সেই পদ পূরণ করেন। তার দারসে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আলেমগণ উপস্থিত হতে শুরু করেন। যুবক আলেমের জ্ঞান ও পান্ডিত্য সবাইকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। কিছু দিন পরেই দামেস্কের প্রধান মসজিদ জামে উমুবীতে তিনি পিতার স্থানে কুরআনের তাফসীর করার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তার জন্য বিশেষভাবে মিম্বার তৈরী

করা হয়। প্রতি সপ্তাহেই তার তাফসীরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কুরআনের তাফসীরের সাথে সাথে সমকালীন সব সমস্যার কুরআনিক সমাধান বর্ণনা করতেন। তার হাতে তৈরী হয় যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আলেম। তাদের মধ্য হতে স্বনামধন্য লেখক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনে কাছীর এবং ইমাম যাহাবীর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

ইমামের মাযহাব

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তারা সকলেই ছিলেন আলিম। তারা ফিক্বহের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাকলীদ করতেন না। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের অনুসরণ করতেন, সুন্নাতের সাহায্য করতেন এবং সালাফী নীতি গ্রহণ করতেন। সুন্নাত ও সালাফী নীতির পক্ষে তিনি এমন এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন, যা তার পূর্বে অন্য কেউ পেশ করার সাহসিকতা প্রদর্শন করতেন না।

সত্য প্রকাশে ইমামের সাহসকিতা

তাতারীদের আক্রমণের খবর যখন সিরিয়ায় পৌঁছল, তখন সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মুসলিমগণ আগেই অবহিত ছিল। তাই তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আশপাশের সকল এলাকা ছেড়ে লোকেরা রাজধানী দামেস্কের দিকে চলে আসতে লাগল। দামেস্কের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে খবর আসলো যে, মিশরের বাদশাহ প্রচুর সেনাবাহিনীসহ দামেস্কের মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছেন। এই খবর শুনে নগরীতে প্রাণের সাড়া জাগলো। মুসলিমগণ নতুন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

৬৯৯ হিজরীর ২৭ রবীউল আওয়াল মাসে তাতারী সম্রাট কাজানের সাথে মিশরের সুলতানের সংঘর্ষ হলো। অনেক চেষ্টা করেও এবং অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করেও মুসলিমরা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। মুসলিমরা হেরে গেল। মিশরের সুলতান পরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর পথে রওয়ানা হলেন।

এবার দামেস্কবাসীরা পড়লো মহাসংকটে। তাতারী সম্রাট সেনাদলসহ এবার বিজয়ী বেশে নগরে প্রবেশ করবে। তাতারী বিভীষিকার কথা চিন্তা করে বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা শহর ত্যাগ করতে লাগল। এর আগেই শহরের বিচারক, পরিচিত আলেম-উলামা, সরকারী অফিসার, বড় বড় ব্যবসায়ী এমনকি

দামেস্কের গভর্ণর নিজের শহরের মায়া ত্যাগ করে মিশরের পথে পাড়ি জমালেন। জনগণের এক অংশও তাতারীদের হত্যাযজ্ঞের ভয়ে দামেস্ক ছেড়ে দিল। এখন কেবল সাধারণ জনগণের একটি অংশই দামেস্কে রয়ে গেল।

এদিকে কাজানের সেনাদল দামেস্কে প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে একটা সিদ্বান্ত গ্রহণ করলেন। তারা সিদ্বান্ত নিলেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে নগরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল কাজানের নিকট যাবে। তারা নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার একটি ফরমান লিখে আনবে।

এ উদ্দেশ্যে তাতারী সম্রাট কাজানের সামনে দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন ইসলামের অগ্রদূত ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ)। কাজানের সম্মুখে ইমাম কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে ন্যায়-ইনসাফের পক্ষে এবং যুলুম নির্যাতনের বিপক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং কাজানের কাছাকাছি হচ্ছিলেন। তার আওয়াজ ধীরে ধীরে উঁচু ও গুরুগম্ভীর হচ্ছিল। কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শুনাতে শুনাতে তিনি কাজানের অতি নিকটবর্তী হচ্ছিলে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পরাক্রমশালী কাজান এতে মোটেই বিরক্তিবোধ করছিলেন না। বরং তিনি কান লাগিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। ইতিমধ্যেই কাজান ইমামের ভাষণে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ইমামের ভাষণ কাজানকে অনুবাদ করে শুনানো হলে তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আলেমটি কে? আমি এমন সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প লোক আজকের পূর্বে আর কখনো দেখিনি। ইতিপূর্বে আমাকে অন্য কেউ এমন প্রভাবিত করতে পারেনি।

লোকেরা ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে কাজানকে জানালো এবং ইমামের ইলম ও কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো। ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ কাজানকে সেদিন বলেছিলেন, হে কাজান! আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনার সাথে রয়েছেন কাযী, শাইখ, মুয়ায্যিন এবং ইমামগণ। এসব সত্ত্বেও আপনি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন, তাদের নারীদেরকে বন্দী করেছেন এবং মুসলিমদের মালামাল লুণ্ঠন করেছেন। অথচ আপনার পিতা ও দাদা কাফের হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের কাজ করতে ইতস্তত বোধ করতেন। তারা নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করেছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আপনি আল্লাহর বান্দাদের উপর মারাত্মক যুলুম করেছেন।

সে সময় ইমামের সাথে ছিলেন প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস। তিনি লিখেছেন, ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) যখন কাজানের সাথে কথা শেষ করলেন, তখন তার ও সাথীদের সামনে খাবার রাখা হলো। সবাই খেতে লাগলেন। কিন্তু ইমাম

হাত গুটিয়ে নিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, এ খাবার হালাল নয়। কারণ গরীব মুসলিমদের থেকে লুট করা ছাগল ও ভেড়ার গোশত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মযলুম মানুষের কাছ থেকে জোর করে কাঠ সংগ্রহ করে তা পাকানো হয়েছে। অতঃপর কাজান ইমামকে দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম দু'আ করতে লাগলেন। দু'আতে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এই যুদ্ধের পিছনে কাজানের উদ্দেশ্য যদি হয় তোমার দীনকে সাহায্য করা, তোমার কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা, তাহলে তুমি তাঁকে সাহায্য করো। আর যদি দুনিয়ার রাজত্ব লাভ এবং লোভ-লালসা চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তাকে ধ্বংস করো। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমাম দু'আ করছিলেন, আর কাযান আমীন আমীন বলে যাচ্ছিলেন। কাযী আবুল আব্বাস নাজমুদ্দীন বলেন, ইমাম যখন কাযানের সামনে বক্তৃতা করছিলেন, তখন আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং নিজেদের জামা-কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। কি জানি কখন ইমামের উপর জল্লাদের তরবারী ঝলসে উঠবে এবং তার রক্তে আমাদের বস্ত্র রঞ্জিত হবে। কাযী নিযাম উদ্দীন আরো বলেন, কাযানের দরবার থেকে বের হয়ে এসে আমরা ইমামকে বললাম, আমরা আপনার সাথে যাবো না। আপনি তো আমাদেরকে প্রায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আপনার কারণে আমাদের উপর বিরাট মসীবত চলে আসার উপক্রম হয়েছিল। ইমাম তখন ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, বরং আমিই তোমাদের সাথে যাবো না। অতঃপর আমরা সকলেই তাঁকে রেখে চলে আসলাম। ইমাম একাই রওয়ানা দিলেন। রওয়ানা দেয়ার সময় কাযান আবার দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম পূর্বের দু'আর পুনরাবৃত্তি করলেন।

ইমামকে একাকী চলতে দেখে স্বয়ং কাযান একদল সৈন্য পাঠিয়ে ইমামের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। ইমামের একাকীত্বের খবর শুনে শহরের একদল লোক বের হয়ে এসে ইমামকে সঙ্গ দেয়ার কথাও জানা যায়। কাযী নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস বলেন, ইমাম নিরাপদে দামেস্কে ফিরে এলেন। ঐদিকে আমাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হলো যে, রাস্তায় একদল লুটেরা বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করলো এবং সর্বস্ব খুইয়ে নিল। আমরা একদম উলঙ্গ হয়ে শহরে ফিরলাম। অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইমাম তাতারীর দরবার থেকে ফিরে আসলেন এবং নগরবাসীর জন্য নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখিয়ে আনলেন। তাতারীরা যাদেরকে বন্দী করেছিল, তাদেরকেও ছাড়িয়ে আনলেন। তাতারীদের বর্বরতার কাহিনী তিনি যেমন শুনেছিলেন, তেমনি নিজ চোখেও তাদের তান্ডব দেখেছিলেন। তারপরও তিনি একটুও বিচলিত হননি। তাতারী সম্রাটের মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে এবং তাতারী সেনাদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে তিনি একটুও ভীতি অনুভব করেননি। তিনি বলতেন, যার অন্তরে রোগ আছে সেই কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করতে পারে।

জিহাদের ময়দানে ইমাম

আল্লাহর দীনকে সকল প্রকার কুসংস্কার-আবর্জনা ও শিরক-বিদ'আত হতে পরিষ্কার করার জন্য শাইখ যেমন আমরণ কলম ও জবান দ্বারা জিহাদ করেছেন, ঠিক তেমনি শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ময়দানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম উম্মার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদেরকে তিনি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি নিজেও ময়দানে নেমে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে সম্রাট কাযানের নিকট প্রবেশ করে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তার সাহসিকতা দেখে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। ৭০২ হিজরী সালের রামাযান মাসে তাতারীদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার শাকহব নামক অঞ্চলে যেই যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তিনি মুজাহিদদের কাতারের সর্বাগ্রে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধে তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। এমনি আরো অনেক যুদ্ধেই তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। মিশরের সুলতান যখন তাতারীদের হাতে দেশ সমর্পন করে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি সুলতানকে ধমক দিয়েছিলেন। জিহাদের প্রতি মুসলিমদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে মুসলিমদের অন্তর থেকে তাতারী আতঙ্ক দূরীভূত করে। আল্লাহর দীনের প্রতি মুসলিমদের অবহেলার কারণে তাদের কপালে যে দুর্দশা নেমে এসেছিল, কুরআন ও সুন্নাহর পথ বর্জন করার ফলে তারা রাজনৈতিকভাবে তারা যে দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল, ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলনে মুসলিমরা নতুন করে জেগে উঠেছিল। মুসলিমগণ নতুন করে জিহাদী চেতনা ফিরে পায়। তাতারীরা ইসলামী সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র বাগদাদ দখল করে খলীফাকে যবাই করে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তে রাজপথ রক্তাক্ত করে তাতারীরা যেভাবে একের পর এক অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সিরিয়ার দামেস্ক এবং মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদেরকে সুসংগঠিত করে সিরিয়া ও মিশরের দিকে তাতারীদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে না দিলে মুসলিমদের ভাগ্যাকাশ কেমন হতো, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

অন্যায় ও অপকর্ম নির্মূলে ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ)

তাতারীরা দামেস্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শহরে প্রকাশ্যে মদ পানসহ নানা অপকর্ম ব্যাপকতা লাভ করে। কারণ তখন সিরিয়া এক সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন ছিল। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) একদল ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শহরে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন এবং মদের দোকানগুলোতে ঢুকে পড়েন। মদের পেয়ালা ও

কুঁজো ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন এবং দোকানের মদ নালায় ঢেলে দিলেন। অন্যায় ও অপকর্মের আস্তানায় প্রবেশ করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন, ইসলামের নির্দেশ বুঝাতেন এবং তাওবা করাতেন। প্রয়োজনে শাস্তি দিতেন। ইমামের অভিযানে সারা দামেস্ক শহরে পুনরায় দীনি পরিবেশ ফিরে পেল।

ভ্রান্ত তাসাউফের কবল থেকে ইসলামী আক্বীদার সংস্কারে ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুমাল্লাহ)

ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগ থেকে খালেস ইসলামী তাসাউফের একটি ধারা চলে আসছিল। ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনই ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীতে এর কর্মধারায় নানা আবর্জনা এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের এক বিরাট গোষ্ঠিও এই আবর্জনা ধোয়া পানি পান করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল। হিজরী অষ্টম শতকে এসে সুফীবাদ এক গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদে পরিণত হয়। তাসাউফের লেবাস ধরে নির্ভেজাল ইসলামী আক্বীদার বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রীক দর্শন, সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈত্ববাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আবর্জনা মিশ্রিত সুফীবাদের দাবীদাররা ইলমকে যাহেরী-বাতেনীতে বিভক্ত করতে থাকে, একজনের বক্ষদেশ থেকে অন্যজনের বক্ষদেশে জ্ঞানের গোপন বিস্তার হয় বলে প্রচার করতে থাকে এবং কামেল পীর-মুরশিদ ও আল্লাহর প্রেমে পাগল ভক্তের জন্য শরীয়াতের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাস তাসাউফের নামে মুসলিমদের বিরাট এক অংশের উপর চেপে বসে।

আল্লাহর অলী ও তার নেক বান্দাদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ন্যায় মুসলিমরাও বাড়াবাড়ি শুরু করে। তাদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে এবং নিজেদের দিলের মাকসুদ পূরা করতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেমগণও অলীদের কবরে ধর্ণা দিত।

ইসলামের নামে এই সব জাহেলীয়াতের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খালেস তাওহীদের দিকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এমন একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত, জাহেলীয়াতের সকল চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং জাহেলীয়াতের মূলোৎপাটন করে মুসলিমদের জন্য সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমল তুলে ধরেন। এই গুরু দায়িত্বটি পালন করার জন্য হিজরী অষ্টম শতকে আল্লাহ তা'আলা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুমাল্লাহ) কে তাওফীক দান করেন। তিনি মুসলিমদের সামনে ইসলামের পরিচ্ছন্ন আক্বীদা বিশ্বাস তুলে ধরেন এবং সকল প্রকার শিরক-বিদআত থেকে ইসলামকে পরিশুদ্ধ করেন।

মুসলিমদের আক্বীদাকে শিরকমুক্ত করা ও তার মূলোৎপাটনে ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুমাল্লাহ) এর প্রচেষ্টা

মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটার স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, ঠিক তেমনি তার মধ্যে যেসব বিমূর্ত এবং অলৌকিক গুণাবলী রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এগুলোর জন্য কোন কৃতিত্ব মানুষের প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কিন্তু মানুষের গোমরাহীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় থেকেই মানুষ মানুষের পূজা করে আসছে। এটা জীবিত ও মৃত উভয় পর্যায়েই স্থান করে নিয়েছে। পীর পূজা, আওলীয়া পূজা, কবর পূজা, মাযার পূজা প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়েছে মানব সমাজে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মুসলিমগণ কোন দিন প্রকাশ্যে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে না। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমরা অবশ্য প্রকাশ্য শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়নি। কিন্তু শিরক মিশ্রিত কার্যকলাপ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মূর্তিপূজার পরিবর্তে তাদের একটি গ্রুপ আওলীয়া পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত রয়েছে। কবরের মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে শহীদদের মাযার। এগুলোকে 'মাশহাদ' বলা হয়। আওলীয়াদের মাযার ও শহীদের মাশহাদ কিছু কিছু জাহেল মুসলিমদের কাছে মসজিদের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা মসজিদের বদলে এগুলোতেই দান-খয়রাত করে, বাতি জ্বালায়, ধন-সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে, এগুলোর উপর দালান-কোঠা ও গম্বুজ নির্মাণ করে। অনেক মাযারের চাকচিক্য ও গম্বুজ মসজিদের সৌন্দর্যকেও হার মানায়।

লোকেরা জাঁকজমকের সাথে বরকতের আশায় এগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করে, গরু-ছাগল নিয়ে যায়। আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজীদের কাফেলার মতই দেখা যায় তাদের কাফেলা। এভাবে মসজিদের পরিবর্তে মাযার ও মাশহাদের দিকেই বিরাট এক শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়।

সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে এই অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার জন্য ইমাম ইবনে তাইমীয়ার রহিমাহুল্লাহ মত একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল। তিনি অজ্ঞ ও জাহেল মুসলিমদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলো ইসলাম নয়; বরং ভিন্ন নামে মূর্তি পূজারই নামান্তর। তার রচনার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিমদের গোমরাহীর আলোচনা এবং কবর ও মাযার পূজার প্রতিবাদ। ৭০২ হিজরীতে সিরিয়া তাতারী আক্রমণ থেকে মুক্ত হবার পর ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ পুনরায় তার সংস্কারমূলক কার্যাবলী শুরু করেন। অধ্যাপনা, তাফসীর ও হাদীছের দার্‌স দান, ইসলামের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত বর্জনের আহবান করেন। সেই সাথে শিরক, বিদআত ও জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে অভিযানও পরিচালনা করেন। এ যুগে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে

বসবাস করার কারণে ইসলাম বিরোধী অনেক আক্বীদা মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সে সময় দামেস্কের অদূরে একটি বেদী ছিল। বেদীটি সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে অদ্ভুত ধরণের বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এটি মুসলিমদের জন্য বিরাট ফিতনায় পরিণত হয়েছিল। মুসলিমরা সেখানে মানত করতো। ৭০৪ হিজরীতে ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) একদল মজুর ও পাথর কাটা মিস্ত্রি নিয়ে সেখানে হাযির হন। তাদের সহায়তায় বেদীটি কেটে টুকরা টুকরা করে নদীতে নিক্ষেপ করে শিরক-বিদ'আতের এই আস্তানাটির মূলোৎপাটন করেন। মুসলিমরা বিরাট একটি ফিতনা থেকে মুক্তি পায়।

ওয়াহদাতুল উজুদ/সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অষ্টম হিজরী শতকে দু'টি দার্শনিক মতবাদ মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে এ ভ্রান্ত মতবাদ দু'টির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। একটি হলো ওয়াহদাতুল উজুদ এবং অন্যটি হুলুল ও ইত্তেহাদ। আমাদের ভারতবর্ষের দার্শনিক পরিভাষায় এ মতবাদ দু'টিকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ। পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের সুফীদের মধ্যেও এ মতবাদ দু'টি প্রবেশ করে। আনন্দের বিষয় হলো, মুজাদ্দেদ আলফেসানী এই মতবাদ দু'টির বিরুদ্ধে প্রচন্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে অতি দু:খের সাথে বলতে হয় যে, ভারতবর্ষের সুফীদের মধ্যে আজও এই মতবাদ দু'টির উপস্থিতি প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এখন পাঠকগণ প্রশ্ন করতে পারেন, আসলে এই মতবাদ দু'টির ব্যাখ্যা কী? ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এ মতবাদ দু'টির প্রধান প্রবক্তা মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, অস্তিত্ব মাত্র একটি। সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। (নাউযুবিল্লাহ) তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, এ দু'টো পৃথক সত্তা হিসাবে তারা স্বীকার করেনা। বরং তাদের মতে স্রষ্টাই হলো সৃষ্টি আর সৃষ্টিই হলো স্রষ্টা। তাদের মতে বনী ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। তারা আরো বলে, ফেরাউনের "আনা রাব্বুকুমুল আ'লা" অর্থাৎ আমি তোমাদের মহান প্রভু, এই দাবীতে সত্যবাদী ছিল। ইবনে আরাবী নূহ আলাইহিস সাল্লামের সমালোচনা করে বলে যে, তার কাওমের লোকেরা মূর্তি পূজার মাধ্যমে আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। আর তার সময়ের মহাপ্লাবন ছিল মারেফতে ইলাহীর প্লাবন। এ প্লাবনে তারা ডুবে গিয়েছিল।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মতবাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করাকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের মতই

সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা কখনোই এক হতে পারে না। আমরা মস্তিস্কের মধ্যে যা কল্পনা করি তার সবগুলোর অস্তিত্ব মস্তিস্কের বাইরে খুঁজে পাওয়া যায়না। আমার মাথায় দশহাত বিশিষ্ট এবং তিন মুখ বিশিষ্ট মানুষের কল্পনা জাগতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে এই ধরণের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে। মস্তিস্কের বাইরে যেসব বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, তা মূলতঃ দু'প্রকার: (১) সৃষ্টি ও (২) স্রষ্টা। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা এমনিতেই হয়ে গেছে। প্রত্যেক জিনিসের একজন উদ্ভাবক ও কারিগর রয়েছে। তাদের উভয়ের স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন নয়। বরং কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য এবং যে তা তৈরী করেছে, তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। মহান আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান, কুদরত এবং ইচ্ছা দ্বারা এই আসমান-যমীন ও এতোদুভয়ের মধ্যকার সকল বস্তু তৈরী করেছেন। সুতরাং তিনি এবং তার তৈরী মাখলুক এক হয় কিভাবে? তার সুউচ্চ ছিফাত এবং সৃষ্টির সাধারণ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এক রকম হয় কিভাবে? আল্লাহ্ ব্যতীত বাকী সকল বস্তু হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" *(সূরা আস সাজদাহ ৩২:৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। কিরূপে আল্লাহ্র পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। *(সূরা আল আন'আম ৬:১০১)*

বাস্তব কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব একটি নয়; বরং দু'টি। একটি স্রষ্টার (আল্লাহর) অস্তিত্ব, আরেকটি সৃষ্টির অস্তিত্ব। কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছে দিবালোকের মত পরিষ্কার করে বলা আছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি আরশের উপরে সমুন্নত, তার সুউচ্চ গুণাবলী সৃষ্টি জীবের গুণাগুণ, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে মিশ্রিত নন, কোন সৃষ্টির ভিতরে নন; যেমন সুফীরা ধারণা করে থাকে। বরং তিনি সৃষ্টির বহু উপরে, সকল সৃষ্টি তার নীচে, তিনি

আসমানের উপরে, আরশের উপর সমুন্নত। উপরে থাকাই আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত বা বিশেষণ।

দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের প্রতিবাদ, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপস্থাপন

কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখেরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে যে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝার কোন সুযোগ নেই। অহীর উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেই সাথে গায়েবী বিষয়গুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খেলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণের গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুকে পড়ে। ইসলামী আক্বীদার উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তার কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, পরিণাম, ক্বিয়ামত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ ধরণের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহর পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এসব চোখেও দেখা যায়না। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে,

ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير

"কোন কিছুই তার সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আশ শূরা ৪২:১১)*"।

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নাহর সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলেম দাঁড়িয়ে যান। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-

তর্ক দার্শনিকদের জবাবে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের যুক্তিগুলো ছিল দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এমনসব জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যার জবাব কালামশাস্ত্রবিদগণ খুজেঁ না পেয়ে তারা নিজেরাই সংশয়ে পড়েছে। ইমাম রাযী শেষ বয়সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি ইলমে কালাম, দর্শন শাস্ত্রের উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পিপাসার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিই আমি নিকটতর পেয়েছি। আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সত্তা ও গুনাবলী সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুসলিম দার্শনিকগণ যে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাতে মোটেই সন্তুষ্টি ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন-সুন্নাহর যুক্তি-প্রমাণ অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্ব্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া আল্লাহর সত্তা ও গুনাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যা আবশ্যক, কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং দার্শনিক কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। ওয়াসিত্বীয়া, তাদমুরীয়া এবং হামুবীয়া এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমামের কারাবরণ

যুগে যুগে যারা সত্য দীনের খেদমতে নিজেদের জীবন ও যৌবন ব্যয় করেছেন, তাদের কেউই যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পান নি। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করার কারণে স্বার্থবাদী ও বিদ্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হন। সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদীদের লোকেরা তাদের মতবাদ প্রচার করার সাথে সাথে প্রকাশ্যে মদ পান এবং সমস্ত হারাম কাজেই লিপ্ত হতো। কারণ তাদের মতানুযায়ী অস্তিত্ব যখন মাত্র একটি তখন হালাল হারামের পার্থক্য থাকবে কেন? শরীয়তেরই বাধ্যবাধকতা থাকবে কেন? তাদেরকে যখন বলা হলো এই বক্তব্য তো কুরআন-হাদীছের বিরোধী, তখন তারা বলল, কুরআন-হাদীছের দলীলের মাধ্যমে নয়; বরং কাশফের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত। মোটকথা কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা, অলী-আওলীয়াদের উসীলা ধরা, তিন তালাকের মাসআ'লাসহ আরো অনেক কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) হিংসুকদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। কুচক্রীরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। মিশরের তদানীন্তন শাসককে তারা ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে

তুলে। আর তখন সিরিয়া ও মিশর ছিল একই রাষ্ট্রভূক্ত। রাজধানী ছিল মিশরের কায়রোতে। সিরিয়া ছিল মিশরের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা সহজেই সরকারকে প্রভাবিত করে ফেলে। তাদের প্ররোচনার ফলে শাহী ফরমানের মাধ্যমে ইমামকে কায়রোতে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ২২ রামাযান জুমু'আর দিন তিনি মিশরে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে কেল্লার জামে মাসজিদে ছ্বলাত পড়ার পর তিনি আলোচনা শুরু করতে চান। কিন্তু তার কিছু কিছু আক্বীদা-চিন্তা ইসলাম বিরোধী হওয়ার অভিযোগে তাকে কথা বলার অনুমতি না দিয়ে জনতাকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর কাযী ইবনে মাখলুফের নির্দেশে তাঁকে কেল্লার বরুজে কয়েকদিন আটক রাখার পর ঈদের রাতে মিশরের বিখ্যাত জুব কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। তার কারাবরণের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ইতিহাসের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ২১বার কারা বরণ করেছেন। যতবারই তার উপর চাপ প্রয়োগ করে অন্যায় স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই তিনি সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শর্তসাপেক্ষ কারাগার থেকে বের হওয়ার সুযোগ তিনি একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। জেলখানার ভিতরে তিনি দেখলেন কয়েদীরা নিজেদের মন ভুলাবার ও সময় কাটানোর জন্য আজে বাজে কাজ করছে। তাদের একদল তাস খেলছে। আরেকদল দাবা খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। ছ্বলাতের দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। খেলার ঝোকে ছ্বলাত কাযা হয়ে যাচ্ছে। ইমাম এতে আপত্তি জানালেন, তাদেরকে ছ্বলাতের প্রতি আহবান জানালেন এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তাদের পাপকাজগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার উপদেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই জেলখানার মধ্যে দীনি ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে গেল যে, সমগ্র জেলখানাটি একটি মাদরাসায় পরিণত হলো। অবস্থা এমন হলো অনেক কয়েদী মুক্তির ঘোষনা শুনেও আরো কিছুদিন শাইখের সংস্পর্শে থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। মূলতঃ সুফীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা, কবর ও মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা, তালাকের মাসআ'লা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি মাসআ'লা নিয়ে ইমামের সাথে বিরোধীদের দ্বন্ধের কারণেই তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়।

কারাগারে থেকেও ইমামের কর্মতৎপরতা

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তারা দুনিয়ার কোন বাধাকে বাধা মনে করেন না। অনুকূল-প্রতিকূল যে কোন পরিবেশেই তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অনুকূল পরিবেশের আশায় তারা কাজ ও প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে চুপচাপ বসে থাকেন না। দামেস্কের কারাগারে

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) একই পন্থা অবলম্বন করলেন। ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তিনি কলমযুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। বিশেষ করে নিজের লেখা বইগুলোতে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিতে থাকলেন। জেলখানার ভিতরে তিনি যা লিখতেন এবং লোকদের প্রশ্নের যেসব জবাব দিতেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই কারাগারের দেয়াল ভেদ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে জেলের পরিবেশ তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছিলেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে। এক সময় তার কাছ থেকে দোয়াত-কলম, খাতাপত্র ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। এগুলো ছিনিয়ে নেয়ার পর জেলখানার ভিতর থেকে ছেড়া কাগজ সংগ্রহ করে কয়লা দিয়ে তার উপরই লিখা শুরু করলেন। এতেই বেশ কয়েকটি পুস্তিকা লিখা হয়ে গেল।

ইমামের উপর মিথ্যারোপ

ইমামের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল, তার সবগুলোই ছিল মিথ্যা ও বানায়োট। সমকালীন স্বার্থান্বেষী মহল,এক শ্রেণীর সুফী সম্প্রদায়, কালামশাস্ত্রবিদ এবং বিদ'আতীরা শত্রুতার বশবতী হয়ে মনের জ্বালা মেটানোর জন্য এবং পার্থিব ফায়দা হাসিল করার জন্যই অভিযোগগুলো করেছিল। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অভিযোগ নতুন কিছু নয়। আজও চলছে সেই ধারাবাহিকতা। কিন্তু বিরোধী ও বিদ'আতীরা তার উপর যেসব মিথ্যারোপ করেছে, তার মধ্যে আশ্চর্যজনক হলো বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন, আমি ৭২৬ হিজরীর রামাযান মাসের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার দিন দামেস্ক শহরে পৌঁছলাম। তখন দামেস্ক শহরে হাম্বলী আলেমদের মধ্যে তকীউদ্দীন ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন অন্যতম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন, তবে তার মস্তিস্কে কিছু সমস্যা ছিল!! দামেস্কবাসীরা তাঁকে খুব সম্মান করতো। তিনি জামে উমুবীর মিম্বারে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। পরের দিন (জুমু'আর দিন) আমি মাসজিদে গিয়ে দেখি, তিনি আলোচনা করছেন। সেদিন তার আলোচনার মধ্যে এটাও ছিল যে, তিনি বলে যাচ্ছিলেন, إن الله يترل إلى سماء الدنيا كترولي هذا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন আমার এই নামার মতই"। এই কথা বলে তিনি মিম্বারের সিঁড়িসমূহের একটি সিঁড়িতে নেমে আসলেন। তখন মালেকী মাযহাবের ফকীহ ইবনে যাহরা (রাহিমাহুল্লাহ) তার বিরোধীতা করলেন। এতে জনগণ উত্তেজিত হয়ে মালেকী ফকীহকে প্রচুর মারপিট করলো। মারপিটের কারণে ফকীহর মাথার পাগড়ী পড়ে গেল......। এই ছিল ইবনে বতুতার মিথ্যাচার।

ইবনে বতুতার এই কথা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হলো, সে উল্লেখ করেছে, ৭২৬ হিজরীর রামাযান মাসের নয় তারিখে দামেস্কে প্রবেশ করল। ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতে শাইখুল ইসলাম তখন দামেস্কের কারাগারে বন্ধী ছিলেন। নির্ভরযোগ্য আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ৭২৬ হিজরীর শাবান মাসে কারাগারে প্রবেশ করেছেন। আর ৭২৮ হিজরী সালের যুলকাদ মাসে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। (দেখুন: তাবাকাতুল হানাবেলা, বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! লক্ষ্য করুন এই মিথ্যুকের প্রতি। সে বলছে যে, রামাযান মাসের কোন এক জুমু'আর দিন ইমামকে জামে উমুবীর মিম্বারে আলোচনা করতে দেখল। এখন প্রশ্ন হলো জামে উমুবীর মিম্বার কি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল? বিশাল জামে উমুবী কি উপস্থিত সকল মানুষসহ কারাগারে প্রবেশ করেছিল? যাতে করে ইমাম সেখানে ভাষণ দিতে পারেন?

এখন কথা হলো, যারা বলে ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা কি ইবনে বতুতার সেই মিথ্যা তথ্যের উপর নির্ভর করেছে? আসল কথা হলো ইমাম কখনোই আল্লাহর কোন ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনা করেননি; বরং তিনি মুশাব্বেহাসহ অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। তার লেখনীগুলোই এর উজ্জল প্রমাণ। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন তার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতের মত নয়। দুনিয়ার আকাশে তার নেমে আসা মাখলুকের নামার মত নয়। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে যেভাবে নেমে আসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই নেমে আসেন। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। আক্বীদা আল ওয়াসেতীয়ার বহু স্থানে তিনি এই মূলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير "তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

ইমামের সুপরিসরে ইলমী খেদমত

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই লিখতেন। জেলখানায় ঢুকিয়েও যখন তাঁকে লেখালেখি থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলোনা, তখন তার নিকট থেকে দোয়াত-কলম ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়ার পর তিনি স্মরণশক্তির উপর ভিত্তি করেই লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকেন। তার লিখিত গ্রন্থাদির সঠিক সংখ্যা

নির্ণয় করা অসম্ভব। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি বহুল প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম উল্লেখ করছি।

(১) মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া, এটি শাইখের সর্ববৃহৎ সংকলন, সৌদি আরব সরকার ৩৭ খন্ডে এটিকে ছাপিয়েছে (২) আল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বীয়া (৩) আল-ফুরকানু বাইনা আওলিয়াইর রহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান (৪) আলকালিমুত তাইয়্যিব (৫) মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবুবীয়াহ (৬) যিয়ারাতুল কুবুর

(৭) শরহুল উমদাহ (৮) আল জাওয়াবুস ছ্বহীহ (৯) রিসালাতুদ তাদমুরীয়াহ (১০) রিসালাতুল হামবীয়া (১১) মুকাদ্দিমাহ ফীত্ তাফসীর (১২) ইক্তেযাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম (১৩) আর্ রাদ্দু আলা ইবনে আরাবী (১৪) আস্ সিয়াসা আশ্ শারঈয়াহ এবং (১৫) আলউ-বুদীয়াহ। এছাড়া দীনের বিভিন্ন বিষয়ে তার আরো অনেক মূল্যবান কিতাব রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে পাঠকদেরকে মাকতাবাতুস শামেলার দ্বারস্থ হওয়ার অনুরোধ করা হলো।

পরলোকের পথে যাত্রা

ইমামের বয়স শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময় একদিন দামেস্কের গভর্ণর কারাগারে ইমামকে দেখতে আসলেন। গভর্ণর তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। জবাবে ইমাম বললেন: আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি, যারা আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। সুলতানের বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় নয়; বরং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার কারণেই আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু আমি ঐসব লোকদেরকে ক্ষমা করতে পারিনা, যারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু। সত্য দীনের প্রতি আক্রোশের কারণে যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং আমাকে কারারুদ্ধ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।

৭২৮ হিজরীর ২২ যুলকাদ মাসে ৬৭ বছর বয়সে উপনীত হয়ে দামেস্কের কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। তার সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এ সময় তার কাছেই ছিলেন। দুর্গের মুআয্যিন মাসজিদের মিনারে উঠে ইমামের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে শহরের সমস্ত মাসজিদে অলিতে-গলিতে, রাজপথে এবং সর্বত্রই ইমামের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলো। শেষবারের মত ইমামকে দেখার জন্য দুর্গের পথে জনতার ঢল নামলো। দুর্গের দরজা খুলে দেয়া হলো। গোসলের পর তার জানাযা শহরের বৃহত্তম মাসজিদ জামে উমুবীতে আনা হয়। জামে উমুবী এবং রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বে আর কোথাও এত বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সালাফদের মানহাজের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রাম, যুক্তি-তর্ক, লেখালেখি, ফতোয়া দান, শিক্ষকতা, দাওয়াত এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এভাবেই চলে গেলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। দীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পার্থিব জীবনের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পাননি। এমনকি বিবাহ করার সুযোগও পাননি। ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) চলে গেছেন। কিন্তু তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং দীনের পথে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা আমাদের আজকের আলেম সমাজকে সজাগ করবে, প্রেরণা যোগাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। দীনের ব্যাপারে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করেন, দীনের উপর কোন প্রকার যুলুম বরদাশত করতে তিনি মুহূর্তকালের জন্যও প্রস্তুত হননি।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার দীনের অতন্দ্র প্রহরী, সেবক ও মর্দে মুজাহিদ আমাদের প্রাণের শাইখকে তোমার রহমতের প্রশস্ত চাদর দ্বারা ঢেকে নাও, তোমার সুবিশাল জান্নাতে তার ঠাই করে দাও এবং নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও ছ্বলিহীনদের সংশ্রবে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে দাও। আমাদেরকেও তাদের সাথে কবুল করে নাও। আমীন

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

আহমাদ ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর পক্ষ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের প্রতি অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী শাইখ আবুল বারাকাত 'আদী ইবনে মুসাফির আল উমুবী আল হাক্কারী এর অনুসারী ও যারা তাদের মতো রয়েছে এমন সকলের প্রতি এ রিসালা বা চিঠি।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার রাস্তায় চলার তৌফিক দিন, তার ও তার রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করুন, তার রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণকারী হিসাবে প্রস্তুত করুন, তাদেরকে সে পথের হিদায়াত দিন- যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন [সকল নাবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং ছ্বলিহ তথা সৎলোকদের পথ]।

আর তাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট এবং বক্রপথের [যারা আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে যে শরী'আত ও পন্থার উপর প্রেরণ করেছেন সে পথ থেকে বেরিয়ে গেছে] অনুসারীদের পথ থেকে দূরে রাখুন। যাতে করে তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া প্রকাণ্ড আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

সালামুন আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অতঃপর, আমরা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব, যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। তিনিই প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কামনা করি তিনি যেন বনী আদমের সরদার, সমস্ত নাবীদের শেষ নাবী, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত মাখলুক, আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি, যার মর্যাদা তার নিকট সবচেয়ে বড়- সেই নাবী মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দা ও রসূল এবং তার সঙ্গী-সাথী ও পরিবার পরিজনদের উপর অধিক পরিমাণে ছ্বলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর, আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি সকল দীনের উপর তা বিজয়ী করেন। আর স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। তার প্রতি শাশ্বত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও হিফাযতকারীরূপে।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার উম্মতের জন্য দীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, তাদের প্রতি নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করেছেন (এবং ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন)।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সূরা আল মায়িদা ৫:৩)

মানব জাতির জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। সূরা আলে ইমরান ৩:১১০

অতঃপর তারা ৭০টিরও অধিক দলে বিভক্ত হবে।

وَإِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاث وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। এদের মধ্যে একটি দল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল সেটি কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত। (হাসান, তিরমিযী হা/২৬৪১)

পবিত্র কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের অনুসারীরাই তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মধ্যপন্থী[১] অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোত্তম জাতি বানিয়েছেন।

---

১. আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। সূরা আল বাকারা ২:১৪৩

আল্লাহ কর্তৃক উম্মাতে মুহাম্মাদীকে দু'টি বিষয়ে হিদায়াত দান।

[بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأمرين]

আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে অন্যান্যদের উপর স্বাক্ষী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

১। আল্লাহ এ উম্মাতকে হিদায়াত দিয়েছেন সে দীনের, যে দীন নিয়ে পাঠিয়েছেন সকল রসূলকে এবং যে দীনকে তিনি সকল সৃষ্টির জন্য প্রবর্তন করেছেন।

২। তারপর তিনি এ উম্মাতকে বিশেষিত করেছেন তাদের জন্য নির্ধারিত এমন শরী'আত ও জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা দ্বারা তাদেরকে তিনি বিশিষ্ট ও সম্মানিত করেছেন।

ক। আল আক্বীদাহ [العقيدة]

প্রথমটির উদাহরণঃ

○ তন্মধ্যে প্রথমটি [আক্বীদার বিষয়সমূহ এবং শরী'আতের কিছু স্থায়ী মৌলিক নীতিমালা যা সর্বযুগে সবার জন্য প্রযোজ্য] এর একটি উদাহরণ হচ্ছেঃ أصول الإيمان " " 'ঈমানের মূলনীতিসমূহ' যার সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায় হচ্ছে " التوحيد " তাওহীদ। আর সে তাওহীদ হচ্ছে, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, أن لا إله إلا الله আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ﴾

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করিনি যার প্রতি এ ওয়াহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। *(সূরা আল আম্বিয়া ২১: ২৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوْتَ﴾

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর ইবাদত কর আর ত্বগূতকে[২] বর্জন কর। *(সূরা আন নাহ্‌ল ১৬: ৩৬)*

---

২. ত্বগূতঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত বা উপাসনা করা হয় এবং উপাস্য সে উপাসনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেই ত্বগূত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মানুষ স্বেচ্ছায়-সন্তুষ্ট চিত্তে

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُوْنَ﴾

তোমার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদত করা যায়। *(সূরা আয যুখরুফ ৪৩: ৪৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ আলাইহিস সালাম-কে। আর যা আমি ওয়াহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা কে- তা এই যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কর না, তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছ তা তাদের নিকট কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। *(সূরা আশ শূরা ৪২: ১৩)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ○ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ﴾

হে রসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার কর, আর সৎ কাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপে অবগত। আর তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের 'রব'। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। *(সূরা আল মুমিমূন ২৩: ৫১-৫২)*

○ এর আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে: আল্লাহর কিতাবসমূহ ও তার নাবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

যার ইবাদত করে, যাকে আহ্বান করে সেই ত্বগূত। হোক তা শয়তান, দেবতা, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হুকুম প্রদানকারী নেতা বা ইমাম, আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক ইত্যাদি।

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং যা অন্যান্য নাবীগণ তাদের রব হতে প্রদত্ত হয়েছিলেন, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী-মুসলিম। *(সূরা আল বাকারা ২:১৩৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾

আর বল, আল্লাহ যে কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর তোমাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা (ন্যায়বিচার) করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। *(সূরা আশ শূরা ৪২: ১৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾

রসূল এর প্রতি তদীয় রব হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও (বিশ্বাস করে)। তারা সবাই আল্লাহকে, তার ফেরেশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে এবং তার রসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে। (তারা বলে) আমরা তার রসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না। তারা এ কথাও বলে যে, ‘আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের ‘রব’ আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে। কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না, কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্যে এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি,

তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের রব! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। *(সূরা আল বাকারা ২: ২৮৫-২৮৬)*

- অপর একটি উদাহরণ হলো, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ও তাতে যে সওয়াব ও শাস্তির বিবরণ এসেছে তার প্রতি ঈমান আনা। যেমন আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতীসমূহের মধ্যে মুমিনদের ঈমান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَالَّــذِيْنَ هَــادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

নিশ্চয় মুমিন, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায় যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের 'রব' এর নিকট পুরস্কার। তাদের কোন প্রকার ভয় নেই। তারা চিন্তিতও হবে না। *(সূরা আল বাকারা ২: ৬২)*

অনুরূপভাবে এর আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে: ইসলামী শরী'আতের মূলনীতিসমূহ। যার আলোচনা সূরা আল আনআম, সূরা আরাফ, সূরা বনী ইসরাঈল ও অনুরূপ বিভিন্ন মক্কী সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যাতে নির্দেশনা এসেছে: এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার- যার কোন শরীক নেই, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখা, চুক্তিপূর্ণ করা, সত্য কথা বলা, ওজন ও মাপে ঠিক দেওয়া, বঞ্চিত ও প্রার্থীকে সাহায্য করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা না করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় গর্হিত কাজ ত্যাগ করা,[৩] গোনাহ ও অন্যায় কর্মে সীমালঙ্ঘন না করা, দীনি বিষয়ে না জেনে কথা বলা থেকে বিরত তাকা ইত্যাদি শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত।

এ ছাড়াও তাওহীদের সাথে আরো অন্তর্ভুক্ত হলো: আল্লাহর দীনকে নির্ভেজালভাবে কেবল আল্লাহর জন্য পালন করা,[৪] আল্লাহর উপর ভরসা করা,[৫] তার

৩. সূরা আল-আন'আম ৬: ১৫১-১৫৩।
৪. সূরা আল আরাফ ৭: ৩৩
৫. সূরা আল মায়িদা ৫:২৩

রহমতের আশা করা[৬] ও তার শাস্তির ভয় করা,[৭] আল্লাহ তা'আলার বিধান পালনে ধৈর্য ধারণ করা,[৮] তার বিধানের প্রতি আজ্ঞাবহ হওয়া,[৯] পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সমগ্র পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে বান্দার নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল অধিক প্রিয় হওয়া[১০] ইত্যাদি। এসব ঈমানের মূলনীতি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের মাক্কী সূরা ও কিছু মাদানী সূরার বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন।

খ। শরী'আত [الشريعة]

দ্বিতীয়টির বর্ণনা,

দ্বিতীয় বিষয়টি [আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এ উম্মাতের জন্য যেসব বিধান প্রবর্তন করেছেন-শরী'আত] যা আল্লাহ তা'আলা মাদানী সূরাসমূহে তার দীনের যে সব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। আর রসূল তার উম্মাতকে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন অর্থাৎ সুন্নাহর প্রচলন করেছেন। [কুরআনে বর্ণিত মাদানী সূরার বিধি-বিধান ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা উভয়টি মিলেই ইসলামী শরী'আত-যা শুধুমাত্র এ উম্মাতের জন্য বিশেষভাবে প্রণয়নকৃত]

কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তার নাবীর উপর কিতাব ও হিকমাহ বা হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তিনি তার নাবীর স্ত্রীদেরকে কিতাব ও হিকমাহ নিয়ে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾

আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি গ্রন্থ ও হিকমাহ (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। *(সূরা আন নিসা ৪:১১৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

---

৬. সূরা আল বাকারা ২: ২১৮
৭. সূরা আল মায়িদা ৫:৩
৮. সূরা আল ইনসান ৭৬:২৪
৯. সূরা আন ফাল ৮:২৪
১০. সূরা আল বাকারা ২:১৬৫, ছ্বহীহ বুখারী ২১, ছ্বহীহ মুসলিম ৪৩।

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন। যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (হাদীছ) শিক্ষা দিচ্ছে। *(সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ (হাদীছ) এর কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে।[১১]

সালফে ছ্বলিহীনের অনেকেই বলেছেন, হিকমাহ হলো সুন্নাহ বা হাদীছ। কেননা কুরআন ছাড়া রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের গৃহে যা পাঠ করা হতো তা ছিল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ। এ জন্য রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ

সাবধান! আমাকে কিতাব ও তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে।[১২]

وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: " كَانَ جِبْرِيلُ – عليه السلام – يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ , وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ

হাসান বিন আত্বিয়া বলেন, জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) যেরূপ কুরআন নিয়ে মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অবতীর্ণ হতেন, তেমনি হাদীছ নিয়েও অবতীর্ণ হতেন। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কুরআনের ন্যায় হাদীছও শিক্ষা দিতেন।[১৩]

---

১১. সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৪। কাতাদাহ বলেন, হিকমাহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ। ইমাম শাফেঈ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো কুরআন। আর হিকমাহ উল্লেখ করেছেন। আর হিকমাহ হলো রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ। (রিসালাতুশ শাফেঈ ৭৮-৭৯)

১২. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬০৪, সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ।

১৩. যঈফ: সুনানে দারিমী হা/৬০৮।

শরী‘আতের বিধানসমূহের দৃষ্টান্ত, যার প্রতি আল্লাহ তা‘আলা এ নাবী ও তার উম্মাতকে হিদায়াত দিয়েছেনঃ যেমন,

কিবলা, কুরবানী বা ইবাদত পদ্ধতি, জীবন-ব্যবস্থা, সঠিক পথ প্রভৃতি। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত নির্ধারিত সংখ্যায় সময়মত আদায় করা, ক্বিরাত পড়া, রুকু ও সিজদা করা, কিবলা তথা বায়তুল হারামের দিকে মুখ ফিরানো।

এ ব্যাপারে আরো দৃষ্টান্তঃ ফরয যাকাত ও তার পরিমাণ যা তিনি মুসলিমদের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে ফরয করেছেন। যথা গবাদি পশু, শস্য, ফলমূল, ব্যবসায়ীক পণ্য, স্বর্ণ, রূপা প্রভৃতি। আর যারা যাকাতের মালের হকদার সে প্রসঙ্গেও আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

ছ্বদাক্বাহ হল ফকীর, মিসকিন ও ছ্বদাক্বাহ (আদায়ের) জন্যে নিযুক্ত কর্মচারী এবং যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য। আর গোলামদের আযাদ করার কাজে ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আর জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও অতি প্রজ্ঞাময় *(সূরা আত তওবাহ ৯:৬০)*

অনুরূপ শরী‘আতের বিধি-বিধানের আরো দৃষ্টান্ত হলোঃ

রমাদ্বান মাসের সিয়াম পালন, বায়তুল হারামে হাজ্জ সম্পাদন করা। আর ঐ সব নিয়ম কানুন ও সীমারেখা যা আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জন্যে বিবাহ, মীরাস, শাস্তি, ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐ সব সুন্নাহসমূহ যা তিনি ঈদ, জুম‘আ, ফরয ছ্বলাতের জামা‘আত এবং কুসূফ, ইসতিসকা, জানাযা ও তারাবীর ছ্বলাতে সুন্নাত হিসাবে বিধিবদ্ধ করেছেন।

আর শরী‘আতের বিধানসমূহের আরো দৃষ্টান্তঃ

যা তিনি অভ্যাসগত রীতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। যথাঃ খাদ্য গ্রহণ, পোশাক পরিধান, জন্ম-মৃত্যু বিষয়ক কার্যাবলী, শিষ্টাচার ইত্যাদি।

আর ঐ সব আহকাম যেগুলো তাদের মধ্যে আল্লাহ ও রসূলের বিধান বলে বিবেচিত। যেমন, খুন-খারাবি, আত্মসাৎ, বিবাহ-সাদি, লাভ লোকসান ইত্যাদির বিধান যা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য তার নাবীর জবানে উম্মাতের জন্য প্রচলন করেছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নিদর্শনসমূহ [سمات الفرقة الناجية]

ক। আল্লাহর রসূলের অনুসরণ-অনুকরণ এবং বিচ্ছিন্নতা ও সামগ্রিক পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি [الاتباع والعصمة عن الضلالة والتفرق]।

আর মুক্তিপ্রাপ্ত দল, আল্লাহ তা'আলাই তাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাদের অন্তরে ঈমানকে সু-সজ্জিত করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে তার রসূলের অনুসারী বানিয়েছেন। পথভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্য হওয়া হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন, যেমন তাদের পূর্বে বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এ কারণেই যখন কোন জাতি পথভ্রষ্ট হতো, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট রসূল প্রেরণ করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْاْ اللهَ وَاجْتَنِبُوْاْ الطَّاغُوْتَ﴾

আর আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এ মর্মে রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগূতকে [সীমালজ্ঘনকারী] পরিহার কর। *(সূরা আন নাহল ১৬:৩৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। *(সূরা আল ফাতির ৩৫:২৪)*

মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীদের মধ্যে সর্বশেষ। তারপর কোন নাবী নেই। সুতরাং আল্লাহ এ উম্মাতকে পথভ্রষ্টতার উপর মতৈক্য হওয়া হতে নিরাপদ করেছেন। আর এ উম্মতের মধ্যে হতে এমন ব্যক্তিদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাদের দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীনের দলিল প্রতিষ্ঠা করবেন। এ কারনেই তাদের ইজমা [মতৈক্য হওয়া] দলিল, যেমনিভাবে কুরআন ও হাদীছ দলিল হিসাবে গণ্য।

এ কারণেই এ উম্মাতের হক্বপন্থীগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে বিশেষিত হয়েছে বাতিল পন্থীদের থেকে, যারা নিজেদেরকে আল কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করতো এবং তারা হাদীছ গ্রহণ করা হতে এবং যার উপর মুসলিম জামা'আত প্রতিষ্ঠিত ছিল তা থেকে বিরত থাকতো।

অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে

জামা'আত বদ্ধ থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

যে রসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল আর যে ফিরে গেল, তাদের উপর আপনাকে রক্ষক বানিয়ে পাঠাইনি। *(সূরা আন নিসা ৪: ৮০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾

আর আমি রসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হয়। *(সূরা আন নিসা ৪: ৬৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾

আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার আনুগত্য কর, ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩: ৩১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

অতএব, তোমার 'রব এর শপথ! তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক নিযুক্ত না করে। *(সূরা আন নিসা ৪: ৬৫)।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُواْ﴾

তোমরা সম্মিলিত ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩)* তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দিবেন। *(সূরা আল*

আন'আম ৬: ১৫৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

আর তাদের মত হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে। *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। *(সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে এবং ছ্বলাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দীন। *(সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

আর এটাই আমার সরল সঠিক পথ, এ পথেরই তোমরা অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও। *(সূরা আল আনআম ৬: ১৫৩)।* আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহায় বলেন,

﴿اهْدِنَــــــا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন; তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। *(সূরা আল ফাতিহা ১: ৬ -৭)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন,

"اَلْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارى ضَالُّوْنَ"

ইয়াহূদীদের উপর গযব বর্ষিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টানগণ পথভ্রষ্ট।[১৪]

সূরা আল ফাতিহা যাকে " أم الكتاب " উম্মুল কিতাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যে সূরাটি তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিনসহ অন্য কোথাও নাযিল করা হয়নি। এ সূরাটি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আরশের নীচের ধন-ভান্ডার থেকে উপহার দেয়া হয়েছে। আর সূরা ফাতিহা পাঠকরা ব্যতীত ছ্বলাত শুদ্ধ হয় না।[১৫]

এ সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন এ মর্মে যে, আমরা যেন সেটার মাধ্যমে আমাদের হিদায়াতের ঐ সরল পথ প্রার্থনা করি, যে পথকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত হিসাবে দান করেছেন- যা নাবী, সত্যবাদী, শহীদ ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের পথ।[১৬] ওটি ইয়াহূদীদের ন্যায় গযব প্রাপ্ত ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় পথভ্রষ্টদের পথ নয়।

এ " الصراط المستقيم " **সিরাত্বল মুসতাক্বীম** বা সরল পথই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নির্ভেজাল দীন ইসলাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটিই "السنة والجماعة" আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ। কেননা নির্ভেজাল সুন্নাহই হলো খাঁটি দীন ইসলাম। এ পথ যারা অনুসরণ করবে, তাদের বলা হবেঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

এ মর্মে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বহু সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- সুনান ও মাসানীদ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন। রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

سَتَفْتَرِقُ هذِهِ الأمَّةُ عَلى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَـةً كُلُّهَا فِيْ النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً ألاَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

অতিশীঘ্রই এ উম্মাত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জেনে রেখ ঐ একটি হল জামা'আত।[১৭]

---

১৪. ছ্বহীহ জামি লিল আলবানী, হা/৮২০২ সনদ ছ্বহীহ

১৫. ছ্বহীহ বুখারী ৭৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম ৩৯৪, ইবনে মাজাহ ৮৩৭, তিরমিযী ২৪৭।

১৬. সূরা আন নিসা ৪:৬৯

১৭. ছ্বহীহঃ ইবনে মাজাহ ৩৯৯২; আবূ দাউদ ৪৫৯৭

অন্য বর্ণনায় ঐ জামা'আত এর পরিচয় দেয়া হচ্ছে এভাবে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَــا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ»

তারা হলো আজ আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, তার উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা।[১৮]

খ। মধ্যপন্থী [الوسطية]: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থী দল।

এ নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল, যারা আহলে সুন্নাহ [أهل السنة] ওয়াল জামা'আত নামে পরিচিত। তারা হলেন সকল দলসমূহের মধ্যে মধ্যপন্থী। যেমন, সমগ্র দীনের মধ্যে ইসলাম হলো মধ্যপন্থী দীন। সুতরাং মুসলিমগণ হলেন আল্লাহ তা'আলার নাবী, রসূল ও পূণ্যবান বান্দাদের মধ্যে মধ্যপন্থী। তারা তাদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে না, যেমন খ্রিষ্টানগণ সীমালঙ্ঘন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَــهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَه" عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম যাজকদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র মাসীহ্‌কে রব বানিয়ে নিয়েছে অথচ তাদের প্রতি এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি তাদের অংশীদার স্থির করা হতে পবিত্র। *(সূরা আত তাওবাহ ৯: ৩১)।*

মুসলিম জামা'আত নাবীদের প্রতি এ ধরনের কোন অবিচার ও জুলুম অত্যাচার করেনি যেমনটি করেছে ইয়াহূদিরা। তারা বহু নাবীকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছে। মানব সমাজে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিতেন তাদেরকেও তারা হত্যা করেছিল।[১৯]

তাদের প্রবৃত্তি ও মতের বিরুদ্ধে যখনই কোন রসূল আসতেন, তখন তাদের একদল তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো ও অপর দল তাদেরকে হত্যা করতো।[২০]

পক্ষান্তরে মুমিন মুসলিমরা কখনোই এ ধরণের কাজ করতে পারে না। বরং তারা আল্লাহর নাবী ও রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদেরকে সাহায্য

---

১৮. হাসান, তিরমিযী ২৬৪১, মুসতাদরাক হাকীম ৪৪৪, কিতাবুল ইলম।
১৯.সূরা আলে ইমরান ৩:২১, ১১২।
২০. সূরা আল বাকারা ২:৮৭।

সহযোগিতা করেন, তাদের সম্মান করেন, ভালোবাসেন ও তাদের আনুগত্য করেন। কিন্তু তারা তাদের (নাবীদের) ইবাদত করেন না এবং তাদেরকে রব হিসাবে মেনেও নেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা কতই সুন্দর বলেছেন:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُواْ عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَـٰكِنْ كُوْنُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُوْنَ، وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে মানবমন্ডলীর মধ্যে এ কথা বলে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার ইবাদত কর, বরং বলবে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষাদান কর এবং ওটা নিজেরাও পাঠ করে থাক। আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণকে ও নাবীগণকে রব হিসাবে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরী করার আদেশ করবেন? *(সূরা আলে ইমরান ৩: ৭৯-৮০)।*

অনুরূপভাবে মুমিনগণ ঈসা আলাইহিস সালাম বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা খ্রিষ্টানদের মতো বলে না যে, ঈসাই আল্লাহ, তার পুত্র অথবা তিন জনের একজন। আর তারা তাকে অস্বীকারও করে না এবং মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর প্রতি গুরুতর অপবাদও আরোপ করে না। যেমন ইয়াহূদীগণ অপবাদ দিয়ে থাকে। বরং মুমিনগণ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর অন্যতম বান্দা ও তার শীর্ষস্থানীয় একজন রসূল, তিনি আল্লাহর কালিমা, যাকে পবিত্রাকুমারী নারী মারিয়ামের পেটে ঢেলে দেয়া হয় এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক রূহ।

অনুরূপভাবে মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার দীনের বিধি-বিধানের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তারা মনে করে আইন প্রণয়ন করা, রহিত করা ও বহাল রাখার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কিছু রহিত করতে চাইলে এবং কোন বিধান বহাল রাখতে চাইলে তারা তার উপর এসব বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না [আল্লাহ যা ইচ্ছা রহিত করেন, আর যা ইচ্ছা বহাল রাখেন], যেমনটি ইয়াহূদীরা বলে থাকে [ইয়াহূদীরা আল্লাহর দ্বারা কোনো বিধান রহিত করার অধিকার নেই বলে থাকে]।

তাই আল্লাহ তা'আলা নির্বোধ লোকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾

মানুষের মধ্যে নির্বোধগণ বলে যে, তারা যে কিবলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল। *(সূরা আল বাকারা ২: ১৪২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনো। তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সে সব কিছুর উপর ঈমান আনি যা আমাদের বনী ইসরাঈল জাতির উপর নাযিল করা হয়েছে। এর বাহিরে যা আছে তা তারা অস্বীকার করে (অথচ) তা একান্ত সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী। *(সূরা আল বাকারা ২: ৯১)*।

আর মুসলিমগণ তাদের বিজ্ঞ আলিমদের ও বুজর্গানে দীনদের জন্যে এটা জায়েয মনে করেন না যে, তারা আল্লাহর দীন পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন। আর যা ইচ্ছে তা শরীয়ত বলে নির্দেশ দিবে এবং যা ইচ্ছে তা হারাম বলে নিষেধ করবে। যেমনটি খ্রিষ্টানগণ তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তাদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾

এসব লোকেরা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলিম ও ধর্ম যাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। *(সূরা আত তওবা ৯: ৩১)*।

এ আয়াতটির উপর আদী ইবনে হাতীম তার প্রতিবাদ করে বলেছিল, হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারাতো তাদের ইবাদত করে না। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যুত্তরে তাকে বলেছিলেন:

"مَا عَبَدُوْهُمْ وَلَكِنْ أَحَلُّوْا لَهُمْ الْحَرَامَ فَأَطَاعُوْهُمْ وَحَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوْهُمْ"

কেন, তোমাদের আলেমরা যা হালাল বলে ফাতাওয়া দেয় তা কি তোমরা হালাল বলে মেনে নাও না। তারা যা হারাম বলে ফাতাওয়া দেয় তা কি তোমরা হারাম বলে গ্রহণ করো না? সে বলল হাঁ। আল্লাহর রসূল বললেন, তাহলে এটাই তো তাদের ইবাদত করা হলো। কেননা হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা তো তার, যিনি রব।[২১]

---

২১. ইমাম তিরমিযী তাফসীর অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি গরীব। আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পক্ষান্তরে, মুমিনদের বক্তব্য হলো সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল আল্লাহর জন্য। যেমন করে কেউ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না তেমনি নির্দেশ-বিধান দেয়ার ক্ষমতাও রাখে না।

আর মুমিনদের কথা হবে 'আমরা শুনলাম ও মানলাম'। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তা তারা মেনে নিয়েছেন। আর তারা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা চান তার আদেশ দেন। *(সূরা আল মায়িদা ৫:১)*

পক্ষান্তরে মাখলুক স্রষ্টার কোন নির্দেশ বা বিধানের পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না, যদিও সে দুনিয়ার মহা ক্ষমতাশালী হয়।

অনুরূপ মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বিষয়ে মধ্যপন্থী। কেননা ইয়াহূদীগণ আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীকে অপূর্ণাঙ্গ মাখ্‌লুকের গুণাবলীর সাথে বিশেষিত করেছে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা গরীব আর আমরা ধনী।[২২] আল্লাহ তা'আলার হাত বন্ধ।[২৩]

তারা আরো বলে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি হতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং তিনি শনিবারের দিন বিশ্রাম ও প্রশান্তি গ্রহণ করেন। এরূপ বহু ভ্রান্ত আক্বীদা ইয়াহূদীরা পোষণ করে থাকে।

আর খ্রিষ্টানগণ মাখলুক তথা সৃষ্ট জীবকে স্বয়ং স্রষ্টার সাথে খাস এ ধরনের গুণাবলীর সাথে বিশেষিত করছে। তারা বলে, আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন, রিযিক দেন, সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া করেন, ক্ষমা করেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, প্রতিদান দিয়ে থাকেন, শাস্তি প্রদান করেন তেমনি মানুষও উক্ত গুণাবলীর অধিকারী।

মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে যার কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, তার কোন উদাহরণও নেই; তিনিই সমগ্র পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী-রব, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া বাকী সবাই তার বান্দা এবং তার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾

আকাশ আর যমীনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দা হয়ে হাজির হবে

২২. সূরা আলে ইমরান ৩:১৮১
২৩. সূরা আল মায়িদা ৫:৬৪

না। তিনি (তার সৃষ্টির) সব কিছুকেই (কড়ায় গন্ডায়) গুনে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এদের সবাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার সামনে আসবে। *(সূরা মারইয়াম ১৯: ৯৩-৯৫)*

অনুরূপভাবে হালাল ও হারামের ব্যাপারে মুমিনগণ মধ্যপন্থী। কিন্তু ইয়াহূদীরা তার বিপরীত, তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের কতক বস্তুকে হারাম করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا﴾

ইয়াহূদীদের বাড়াবাড়ি আর বহু লোককে আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল।[২৪]

ইয়াহূদীরা নখবিশিষ্ট প্রাণীর গোশত খেত না। যেমন, উট, হাঁস ইত্যাদি। পাকস্থলির ঝিল্লির চর্বি, দুই কিডনীর গোশত ও বকরীর দুধ প্রভৃতি তারা খেত না, যা তারা তাদের নিজেদের উপর বিভিন্ন খাদ্য ও পোশাক ইত্যাদি হারাম করেছিল। এমন কি বলা হয়ে থাকে (খাদ্য, পোষাক ছাড়াও) তাদের উপর তিনশত ষাট ধরণের বস্তু হারাম ছিল। দুইশত আটচল্লিশটি বিষয় তাদের উপর ছিল কঠোর বিধান।

অনুরূপভাবে নাপাকীর বিষয়ে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলার সঙ্গে তারা খানা-পিনা খেত না এবং একসঙ্গে একই ঘরে বসবাস করতো না।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানগণ যাবতীয় অপবিত্র জিনিস ও সমস্ত হারাম দ্রব্য হালাল করে নিয়েছিল। সকল প্রকার নোংরা অপবিত্র জিনিসের অনুশীলন করেছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের শুধু এ কথা বলেছিলেন, যার বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾

---

২৪. সূরা আন নিসা ৪: ১৬০। ইবনে কাসীর রহি. বলেন, ইয়াহূদীদের বড় বড় গুনাহের কারণে তাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু ইতিঃপূর্বে হালাল ছিল তা হারাম করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাতে যেসব বস্তু ইতিঃপূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল তা হারাম করে দেয়া হয়েছে। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৩।] তারপর আল্লাহ তাওরাতে অনেক কিছুকে তাদের উপর হারাম করে দেন। [সূরা আল আনআম, আয়াত ১৪৬।] অর্থাৎ আমি এসব বস্তু তাদের উপর হারাম করেছি, কারণ তারা তাদের অপকর্ম, হঠকারিতা, বাড়াবাড়ি ও রসূলের বিরোধিতা করার কারণে এ ধরণের শাস্তি প্রাপ্য ছিল। [সূরা আন নিসা, আয়াত ১৬।] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫৮৫/১।

আর যাতে আমি হালাল করি কতক এমন বস্তু যা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছিল। *(সূরা আলে ইমরান ৩:৫০)* এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

যেসব আহলে কিতাব আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে না, আর কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তার রসূল হারাম করেছেন, আর সত্য দীনকে নিজেদের দীন (ইসলাম) হিসাবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া (কর) দেয়। *(সূরা আত্-তাওবাহ ৯:২৯)* পক্ষান্তরে মুমিনগণ! যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন,

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর আমার দয়া (রহমত) তো (আসমান যমীনের) সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমি অবশ্যই তা লিখে দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় (তাক্বওয়া অবলম্বন করে) করে, যারা যাকাত আদায় করে, যারা আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে। যারা এ বার্তাবাহক উম্মী (নিরক্ষর) রসূলের অনুসরণ করে চলে যার উল্লেখ তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়। যে নাবী তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের উপর হারাম ঘোষণা করেন, তাদের ঘাড়ে যে বোঝা ছিলো তা তিনি নামিয়ে দেন এবং যে সব বন্ধন তাদের গলার উপর ছিলো তা তিনি খুলে ফেলেন। অতএব, যারা তার উপর ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে আর তার উপর অবতীর্ণ আলোর (কুরআন) অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম। *(সূরা আল আরাফ ৭:১৫৬-১৫৭)*

এ প্রসঙ্গে তাদের আরো বহু গুণাবলী রয়েছে, যা বর্ণনা করতে গেলে অধ্যায়টি অনেক দীর্ঘ হবে।

অনুরূপভাবে দল সমূহের মধ্যেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থী দল [أهل السنة وسط في الفرق]।

মুমিনগণ আল্লাহর নাম ছিফাত ও আয়াতসমূহের বিষয়েও মধ্যপন্থী। তারা **أهل التعطيل** আহলে তা'তিল তথা নির্গুণবাদী যারা আল্লাহর নাম ও ছিফাতসমূহকে অর্থহীন করে, আর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তারা তাকে অকার্যকর বলে আখ্যায়িত করে।[২৫] এমনকি তারা এগুলোকে অস্তিত্বহীন ও মৃতের সঙ্গে তুলনা করে।

মুমিনগণ তাদের **أهل التعطيل** [আহলে তা'তিল] ও " **أهل التمثيل** " আহলে তামসীল[২৬] তথা স্বাদৃশ্যবাদীদের মধ্যে মাঝামাঝি অবস্থানে। এ আহলে তামসীল অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ও তাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে। [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উদাহরণ বর্ণনা করে এবং সৃষ্ট জীবের সঙ্গে আল্লাহকে সাদৃশ্য স্থাপন করে]।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তেমনি যেমন তিনি তার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার **تحريف**

---

২৫. মু'আত্তিলাহ: ঐ সব লোক যারা আল্লাহর ছিফাতসমূহকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ছিফাতগুলো তার সত্তার সাথে থাকার কথাকে মানে না। আল্লাহর যে সবগুণ তার স্বয়ং সম্পন্নতা ও কামালিয়াতের প্রমাণ, তারা তা আল্লাহ থেকে অস্বীকার করে। সর্বপ্রথম ইসলামে এ ভ্রান্ত আক্বীদা যিনি চালু করেন, তার নাম জা'আদ ইবন দিরহাম। আর তার থেকে এ বিষয়গুলো গ্রহণ করে তার ছাত্র জাহাম ইবন সাফওয়ান।

২৬. এর অর্থ সাদৃস্য স্থাপন করা। যেমন, একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর সাথে তুলনা করা। উভয় বস্তুকে সমান মনে করা, কোন বস্তুকে অপর বস্তুর মতো করে তৈরি করা। সুতরাং আল্লাহর ছিফাত ও গুণাবলী কখনো মাখলুকের ছিফাত বা গুণাবলীর সাদৃশ্য হতে পারে না। কারণ, আল্লাহর সত্তা, ছিফাত, নামসমূহ এবং কর্মে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই, তার কোনো সাদৃশ্য নেই এবং তার কোনো তুলনা নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

তার মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সূরা আশ শূরা ৪২: ১১]

সাদৃশ্য স্থাপন করা দু'প্রকার:

এক- সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করা। যেমন, খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে এবং উযাইর আলাইহিস সালামকে এবং মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে।

দুই- স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমন, সাদৃশ্যবাদীরা বলে, আল্লাহর আমাদের হাতের মতো হাত রয়েছে আর আমাদের কানের মতো কান রয়েছে। আর বস্তুত সব সাদৃশ্যবাদীরাই মুআত্তিলা বা নির্গুণবাদী।

তাহরীফ-বিকৃতি, تعطيل তা'ত্বীল-শূন্যকরণ, تكييف তাকয়ীফ[২৭]-আকৃতি প্রদান ও تمثيل তামছীল-উদাহরণ উপস্থাপন করা ছাড়া।

অনুরূপভাবে মুমিনগণ 'আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশ' অধ্যায়েও মধ্যপন্থী। তারা আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়া: যারা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, তার সার্বজনীন ইচ্ছা এবং তিনি যে সব কিছুর স্রষ্টা তার উপর ঈমান রাখে না, অথচ তিনি সবকিছুর স্রষ্টা।

মুমিনগণ সে ক্বাদারিয়া সম্প্রদায় ও জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝামাঝি অবস্থানে। কারণ এ জাবরিয়া সম্প্রদায় বলে: বান্দার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই, তার কোন ইচ্ছা নেই, সে কোন কাজই করতে পারে না; যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষে থেকে হয়। তাই তারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, সওয়াব ও শাস্তির সকল বিধান বাতিল ও অকার্যকর মনে করে। ফলে তারা ঐসব মুশরিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না। আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতাম না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾

যারা শিরক করে তারা বলে: আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না, আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না। *(সূরা আল আন'আম ৬: ১৪৮)*

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি বান্দাদের হিদায়াত-সুপথে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন, বান্দাদের হৃদয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি যা চান তা হয়, আর যা তিনি চান না, তা হয় না। তার রাজত্বে এমন কিছু সংঘটিত হয় না যার ইচ্ছা তিনি করেননি। তার ইচ্ছা বাস্তবায়নেও তিনি অপারগ নন। তিনি বস্তুনিচয়, গুণাগুণ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা।

---

২৭. তাকয়ীফ: কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট ধরন বর্ণনা করা বা ধরন সাব্যস্ত করাকে তাকয়ীফ বলা হয়। কোনো বস্তুর ধরন হলো, তার অবস্থা বা তার গুণাগুণ নির্ধারণ। আর আল্লাহর অবস্থা বা ধরন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তার স্বীয় ইলমে সংরক্ষণ করেছেন। এ বিষয়গুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। কোনো মাখলুকের জন্য সে সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, গুণ সব সময় সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। সত্তার ধরনকেই যদি জানার সুযোগ না থাকে তাহলে তার ছিফাতের ধরন কীভাবে জানা সম্ভব হবে?। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাকে ইস্তেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইস্তেওয়া ধরন কি? উত্তরে তিনি বললেন, ইস্তেওয়া অবশ্যই প্রমাণিত ও তার অর্থ বিদিত, কিন্তু তার ধরন অজ্ঞাত, এর ওপর বিশ্বাস ওয়াজিব এবং এর ধরন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা বিদ'আত।

আর তারা এ কথাও বিশ্বাস করে যে, বান্দার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও কর্ম রয়েছে। সে ইচ্ছে মাফিক কাজ করতে পারে। তারা তাদেরকে বাধ্য বলে বিশ্বাস করে না। কারণ বাধ্য বলা হয় যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোড় করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার কর্মে স্বাধীন বানিয়েছেন। সুতরাং সে স্বাধীন, ইচ্ছাকারী। আল্লাহ তা'আলা যেমনি বান্দার স্রষ্টা, তেমনি তার ইখতিয়ার বা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিরও স্রষ্টা। এ ক্ষমতায় তার কোন সমকক্ষ নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এমন এক সত্তা, যার সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নাম-ধাম প্রদান করা (মুমিন, কাফির বলা) বিধি-বিধান, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ও হুমকির বিষয়েও মধ্যপন্থী। তারা চরমপন্থী তথা খারিজিঃ যারা মুসলিমদের মধ্যে কাবীরা গুনাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে আজীবন জাহান্নামী মনে করে, ঈমান থেকে সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে বের করে দেয় তথা সম্পূর্ণ মুশরিক ভাবে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত বা সুপারিশকে অস্বীকার করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা মুমিনগণ সে খারিজি সম্প্রদায় ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাঝামাঝি অবস্থানে।

এ المرجئة মুরজিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে, পাপীদের ঈমান আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ঈমানের সমতুল্য। নেক আমল দীন ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর শাস্তিমূলক সতর্কবাণী ও শাস্তি প্রদানকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, পাপিষ্ঠ মুসলিমের মূল ঈমানসহ আংশিক ঈমান বিদ্যমান থাকে। তারা পূর্ণাঙ্গ মুমিন নন। তাদের সাথে এমন পরিপূর্ণ ঈমান নেই যদ্বারা তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হবে। তবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং যার হৃদয়ে শস্যদানা ও শরিষার দানা সমতুল্য ঈমান আছে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যে শাফা'আত সংরক্ষণ করেছেন।

অনুরূপভাবে মুমিনগণ, ছাহাবীদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী দলেরও মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছেন। কারণ সীমালঙ্ঘনকারীরা আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে। তারা আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) -কে আবু বকর (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উক্ত দু'জন ব্যতীত আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) -ই একমাত্র নিষ্পাপ ইমাম। তারা বলে থাকে যে, ছাহাবীগণ যুলুম-অত্যাচার ও পাপ কর্ম করেছেন। তারা পরবর্তী মুসলিম উম্মাহকে কাফির বলে থাকে। কখনো কখনো তারা আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু)-কে নাবী ও ইলাহ বানিয়েছেন। আহলে

সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সেই গালিয়া তথা শিয়া-রাফিযী সম্প্রদায় ও জাফিয়া তথা অসম্মানকারী সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি অবস্থানে। আর জাফিয়া -অত্যাচারী দল, তারাই যারা এ আক্বীদা রাখে যে আলী ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয় কাফির। তারা তাদেরকে ও তাদেরকে যারা ক্ষমতাসীন করেছেন তাদের রক্ত হালাল মনে করেন। তাদেরকে গালি দেয়া বৈধ মনে করেন। তারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার খিলাফত বিষয়ে অপবাদ দেয়, দুর্নাম ও গালি-গালাজ করে। অনুরূপভাবে মুমিনগণ সকল সুন্নাতের অনুসরণের বিষয়ে মধ্যপন্থী। কারণ তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছকে যথাযথ আঁকড়ে ধারণকারী। আর তারা পূর্ববর্তী-অগ্রগামী মুহাজির, আনসার ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাদের অনুসরণকারীগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন তারই উপর তারা প্রতিষ্ঠিত।

অনুচ্ছেদ

মনে জাগরুক করা ও স্মরণ করা [إشادة وتذكير]

দীনকে অটলভাবে আঁকড়ে ধরা এবং দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা বর্জন করা

হে পাঠক মন্ডলী! আপনারা, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সংশোধন করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি আপনাদেরকে তার দীন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিক যারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে তাদের যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা থেকে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে রক্ষা করেছেন। নি'আমাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ও মহান নিয়ামত হলো ইসলাম। তাই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন তথা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন (জীবন ব্যবস্থা) অনুসন্ধান করবে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা আলে ইমরান ৩: ৮৫)*

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত করে الروافض রাফিযী,[২৮] الجهمية

---

২৮. রাফিযী সম্প্রদায়ের নামকরণের মূল হচ্ছে, যায়েদ ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবী তালেব হিশাম ইবন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হওয়ার পর যায়েদের অনুসারীদের কেউ কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অপবাদ ও গালি দেয়। তখন তিনি তাদের নিষেধ করেন। তারা শুনলো না বরং তার সঙ্গ ত্যাগ করল। তার সাথে কেবল একশত অশ্বারোহী ছিল। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা আমাকে রফদ্ব করলে অর্থাৎ ছেড়ে দিলে? তারা বলল, হাঁ, তারপর থেকে তাদের রাফেযী বলা হতো। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের রাফেযী বলার কারণ, তারা যায়েদ ইবন আলীকে ছেড়ে চলে যায়। তারা আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি তাদের প্রসংশা করেন এবং বলেন, আমি আমার পিতাকে তাদের বিষয়ে ভালো ছাড়া কোন খারাপ মন্তব্য করতে দেখিনি। তারা দুই আমার দাদার দুই বাহু ছিলেন সুতরাং আমি তাদের থেকে দায় মুক্তি ঘোষণা দিতে পারবো না। তার কথা শোনে তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং প্রত্যাখ্যান করল এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তাদের বললেন, তোমরা আমাকে রফদ্ব

জাহমীয়া,[২৯] الخوارج খারিজী[৩০] ও القدرية ক্বদারীয়ার[৩১] মতো পথভ্রষ্ট বহু বিদ'আতী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। যাদের অনেকেই আপনাদের সামনেই আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ, গুণাবলী, তার বিচার-ফায়সালা ও তাকদীর নির্ধারণকে অস্বীকার করেছে অথবা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদেরকে গালি দিয়েছে। যাকে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম নামক নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন তার জন্য এটিই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ এ ইসলামই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতা ও দীনের সম্পূর্ণতা।

এ কারণেই আপনাদের মধ্যে বহু দুনিয়া বিমুখ দীনদার, পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী, যোদ্ধা ও মুজাহিদ রয়েছে যার দৃষ্টান্ত বিদ'আতী গোষ্ঠীদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। সাহায্যপ্রাপ্ত মুসলিম সৈন্য ও আল্লাহর বাহিনীর মধ্যে তোমাদের এমন সব লোক সব সময়েই রয়েছে যাদের কারো দ্বারা আল্লাহ এ দীনকে শক্তিশালী করেন এবং মুমিনদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা দুনিয়া বিমুখ ও ইবাদতকারী, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও আছে যার রয়েছে অনেক পাক-পবিত্র ভালো অবস্থা এবং সন্তোষজনক পন্থা। আর তার রয়েছে দূরদর্শিতা ও অসাধারণ প্রতিভা। তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ওলী-বন্ধু, যারা আল্লাহকে ভয় করতো, দুনিয়াতে যাদের রয়েছে সততার সু-খ্যাতি। কারণ পূর্বের মনীষীগণ যেমন, শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে ইউসুফ আল-কুরাশী এবং তারপর বিশিষ্ট শেখ আদী ইবনে মুসাফির আল উমাওয়ী এবং আরো যারা তাদের পথের পথিক, তাদের দীনদারী, সুন্নাতের অনুসরণ ও তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের সম্মান কত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মর্তবাকে কত মহান করেছেন।

করলে বা ছেড়ে দিলে। সে সময় থেকে তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। তারপর নামটি শিয়াদের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

২৯. জাহাম ইবন সাফওয়ানের অনুসারী। তারা বলে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা তাতে প্রবেশ করার পর জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তারা বলে ঈমান হলো, শুধু আল্লাহকে জানা আর কুফর হলো, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৩০. খারেজী যারা তাহকীম তথা শালিসের পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ ত্যাগ করেন। কারণ, তিনি শালিস কবুল করেন। অথচ তারাই তাকে শালিস মেনে নেওয়ার জন্য বাধ্য করেন। তারা বলেছিল, অপর পক্ষ আমাদের আল্লাহর কিতাবের দিক আহ্বান করছে আর তুমি আমাদের তলোয়ারের দিকে আহ্বান করছ? তারপর যখন আলী রা. তাদের কথা অনুযায়ী শালিস মেনে নেন, তখন তারা বলে, তুমি কাফের হয়েছো। কারণ, তুমি মানুষকে বিচারক মানছো।

৩১. কাদারিয়্যাহঃ যারা কাদর তথা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদের বলা হয় কাদারিয়্যাহ। তারা বলে, কোনো কদর তথা পূর্ব নির্ধারিত কিছু নেই, সব কর্ম নতুন। তারা আরো বিশ্বাস করে সব বান্দা তার কর্মে স্রষ্টা। তাদের কাদারিয়্যাহ এ জন্য বলা হয়, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাদরকে অস্বীকার করে এবং সবকিছু বান্দার পক্ষ থেকে হয় অর্থাৎ কাদরকে তারা বান্দার জন্য সাব্যস্ত করে। এদেরকে এ উম্মতের মাজুসী বলা হয়ে থাকে।

আর শাইখ আদী ছিলেন আল্লাহর নেক বান্দা ও সুন্নাতের অনুসারী বড় বড় মাশাইখ ও সম্মানী মনীষীদের অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী এবং উন্নত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রবিন্দু যা জ্ঞানী বলতে সবাই জানতো। উম্মাতের মধ্যে তার অবদান খুবই সু-প্রসিদ্ধ এবং তার সততা খুবই আলোচিত। আর তার থেকে যে আক্বীদা বা বিশ্বাস পাওয়া যায় তা তার পূর্বের যে সব মাশাইখদের পথের পথিক ছিলেন তাদের আক্বীদা বা বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ছিল না। যেমন বিশিষ্ট ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আনসারী আশ শীরাযী (দামেশকী) এবং শাইখুল ইসলাম (আল হাক্কারী) ও আরো যারা তাদের উভয়ের মতো। এ সব মাশাইখ (আক্বীদা ও আমলের) বড় বড় মূলনীতিসমূহের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতিসমূহ থেকে বের হননি। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতিসমূহের প্রতি তাদের ছিল সযত্ন চলাচল ও আগ্রহ উদ্দীপনা এবং তা প্রচার প্রসার ঘটানোর প্রতি ছিল প্রকট আগ্রহ ও চাহিদা। আর যারা দীন, ফযল ও ভালো কাজের বিরোধিতা করতো তাদের প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তারা ছিলেন উদগ্রীব।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে কতইনা বৃদ্ধি করেছেন। তারা তাদের বড়দের মূলনীতি সম্পর্কে শুধু বলতোঃ ভালো, কোনো মন্তব্য করতো না। অথচ তাদের কথা এবং তাদের মতো যারা রয়েছেন তাদের বিষয়ে এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, তাদের কথার মধ্যেও দুর্বল হাদীছ, অগ্রহণযোগ্য কথা-বার্তা ও বাতিল কিয়াস রয়েছে যা কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী জ্ঞানীরাই ধরতে পারেন।

কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কারো কথাই নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণীয়ও হতে পারে এবং বর্জনীয়ও হতে পারে। বিশেষ করে পরবর্তী যুগের অনেক মুসলিম যারা পবিত্র কুরআন, হাদীছ এবং এ দু'য়ের সমন্বয়ে নির্গত ফিক্বহের আলোকে সমাধান গ্রহণ করেনি।

তারা ছ্বহীহ ও যঈফ হাদীছসমূহের মধ্যে পার্থক্যও করেনি। কিয়াস করার পরিণতি ও তার ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে তারা এত বেশী সতর্কও ছিল না। বস্তুতঃ এ সব কারণগুলোর সাথে সাথে আরো যোগ হয়েছিল, তাদের প্রবৃত্তি চর্চার প্রাধান্য, মানব রচিত মতাদর্শের আধিক্য, মতভেদ ও দলাদলির প্রকট রূপ এবং শত্রুতা ও বিভক্তির বিভীষিকা। উল্লেখিত বিষয়াবলী ও এ জাতীয় কারণগুলো মানুষের মধ্যে দু'টো অন্যায়ের উদ্রেক করে। মানুষের মধ্যে যুলুম-অত্যাচার ও অজ্ঞতার শক্তিকে বৃদ্ধি করে। যে দু'টি গুণে মানুষ গুণান্বিত হওয়ার কথাটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। যাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেছেন।

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৭২)*

যখন আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রতি জ্ঞান ও ন্যায় দ্বারা ভূষিত করার মাধ্যমে দয়া করেন, তখন তিনি তাকে এ ধরনের গোমরাহী থেকে নাজাত দেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। *(সূরা আল আসর ১০৩:১-৩)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। *(সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪)*

মুক্তির পথ [سبيل النجاة]

আপনারা অবগত আছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সংশোধন ও সংস্কার করুন। নিঃসন্দেহে আক্বীদার যাবতীয় বিষয়সমূহে, ইবাদতের যাবতীয় বিষয়সমূহে ও সার্বিক জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সুন্নাতের অনুসরণ করা আবশ্যক এবং যে সুন্নাতের অনুসারীগণ প্রশংসিত ও যে সুন্নাহর বিরোধীতাকারীরা নিন্দিত, তা হলো মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত [السنة]।

বস্তুতঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছসমূহ জানার মাধ্যমে তা জানা যাবে, যা তার কর্তৃক কোন কথা ও কর্ম সু-প্রমাণিত হবে বা কোন কর্ম, কথা ও আমল যা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তা জানা যাবে, আর পূর্বসূরীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরবর্তীগণ যারা একনিষ্ঠতার সাথে তাদের আনুগত্য করেছেন তা থেকে জানা যাবে।

এটা জানার একমাত্র উপায় ইসলামের প্রসিদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার কিতাবসমূহ হতে। যেমন- দু'টি **صحيحي البخاري ومسلم** ছ্বহীহ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম। সুনান গ্রন্থাবলী, যথা- **سنن أبي داود** সুনানে আবূ দাউদ, **النسائي** নাসাঈ, **جامع الترمذي** জামিউত তিরমিযী, **موطأ الإمام مالك** মুয়াত্তা মালিক; বিখ্যাত মুসনাদ গ্রন্থাবলী যথা- **مسند الإمام أحمد** মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি।

আরো রয়েছে " **التفاسير** " তাফসীরের কিতাবসমূহে, " **المغازي** " মাগাযী বিষয়ক কিতাবসমূহে ও অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থাবলী যেগুলোতে ইসলামের বিভিন্ন দিকগুলো উম্মাতের জন্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আর **الآثار** আছার[৩২] সম্বলিত সংক্ষেপে রচিত ও সংক্ষিপ্ত হাদীছের গ্রন্থাবলী যা এক অংশ অপর অংশকে সু-প্রমাণিত করে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। তারা এ মর্মে যথোচিত শ্রম প্রদান করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা দীনকে তার অনুসারীদের জন্যে তাদের দ্বারা সুরক্ষিত করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বিষয়ে বহু আলিম হাদীছ ও আছারসমূহ সংকলন করেছেন। যথা- হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, আব্দল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারিমী, উসমান ইবনে সাঈদ দারিমীসহ তাদের স্তর

---

৩২ . ছাহাবীদের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আছার বলে।

বিশিষ্ট অনেকে। তাদের মতোই ইমাম বুখারী এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ স্বীয় গ্রন্থাবলীতে অধ্যায় অধ্যায় করে সুবিন্যাস্ত করেছেন।

আবু বকর ইবনে আছরাম, আব্দল্লাহ ইবনে আহমদ, আবু বকর, খাল্লাল, আবুল কাসিম ত্ববরানী, আবু শাইখ আছবাহানী, আবু বকর আজুররী, আবুল হাছান দারাকুতনী, আবু আব্দল্লাহ ইবনে মানদাহ, আবুল কাসিম লালকাঈ, আবু আব্দল্লাহ ইবনে বাত্তাহ, আবু উমার ত্বলমানকী, আবু নঈম আছবাহানী, আবু যর হারওয়ী, আবু বকর বায়হাকীসহ অনেকের স্বতন্ত্র রচিত গ্রন্থাবলী।

যদিও এসব অনেক গ্রন্থাবলীতে কোনো কোনো স্থানে যঈফ হাদীছসমূহ স্থান পেয়েছে যা বিজ্ঞ আলিমগণ সনাক্ত করতে সক্ষম। আবার দেখা যায় কোনো কোনো মনীষী আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীসহ আক্বীদাগত বিভিন্ন বিষয় ও দীনের অনেক বিষয়ে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যাচার এবং তা জাল। আর এ ধরনের জাল ও বানোয়াট হাদীছ সাধারণ দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার হলো: এমন ভিত্তিহীন বাতিল কথা যা উচ্চারণ করাই অবৈধ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত করাতো দূরের কথা।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: এমন কথা যা কোনো পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা আলিম অথবা কোন সাধারণ লোক বলেছেন। আর তা কখনও সঠিকও হতে পারে বা ইজতিহাদী ফাত্ওয়া-যার মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করা যেতে পারে অথবা কোনো প্রবক্তার মাযহাবী দর্শনও হতে পারে। পরবর্তীতে তা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে হাদীছ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা যারা হাদীছ জানে না তাদের কাছে অনেক। এ ধরনের কতক মাসআলা যেগুলো আবিষ্কার করেছেন শাইখ আবুল ফরজ আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আনসারী। তিনি তার কিতাবটিকে সুন্নী ও বেদয়ীর মধ্যে পার্থক্যকারী আখ্যায়িত করেন। এগুলো বেশ কিছু প্রসিদ্ধ বিষয়। এ কাজ কতক মিথ্যুক করেছে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদ রচনা করে এগুলোকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। যার মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানও থাকে সে জানে যে এটি মিথ্যা ও বানোয়াট।

এ ধরনের মাসায়েল যদিও এর অধিকাংশ সুন্নাতের মূলনীতিসমূহের অনুসরণে হয়, তারপরও যদি কেউ এর বিরোধিতা করে তাকে এ কথা বলা যাবে না যে, লোকটি বিদ'আতী। যেমন সর্বপ্রথম নি'আমাত যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার কোনো বান্দাকে অনুগ্রহ করেন এ মাসআলাটি বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে

মতপার্থক্য রয়েছে। তবে মতপার্থক্যটি তাদের মাঝে শাব্দিক। কারণ এর ভিত্তি হলো, যে মজার পর কষ্ট আসে তাকে নি'আমাত বলা হবে কিনা? এখানেও কিছু গুরুত্বহীন কথাবার্তা বিদ্যমান। সুতরাং কর্তব্য হলো ছ্বহীহ ও জাল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করা। কারণ, সুন্নাহ হলো শাশ্বত সত্য, মিথ্যা ও বাতিল হক হতে পারে না। আর তাহলো ছ্বহীহ হাদীছসমূহ; জাল হাদীছ নয়। সাধারণভাবে এটাই মুসলিমের জন্য এবং বিশেষ করে যারা নির্ভেজালভাবে সুন্নাতের অনুসরণের দাবীদার তাদের জন্যে একটি বড় মূলনীতি। ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর দীন হলো বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মাঝে মধ্যপন্থা। আল্লাহ তার বান্দাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে শয়তান দুটি বিরোধিতা করেছে।

পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার দীন তথা জীবন ব্যবস্থা হলো বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মাঝে মধ্যপন্থা। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে শয়তান দু'টি জিনিস তুলে ধরেছে যে কোনো একটি দ্বারা সফল হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এক- সীমালঙ্ঘন, দুই- শিথিলতা। এ দু'টি কোনটি দিয়ে সফলতা আসল তা তার দেখার বিষয় নয়।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শাশ্বত দীন তথা জীবন ব্যবস্থা। এ দীন গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা কারও নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না। অথচ ইসলামে দীক্ষিত অনেককেই শয়তান গ্রাস করেছে। এমনকি বহু লোককে ইসলামের অনেক বিধান থেকে শয়তান বিচ্যুত করেছে। বরং উম্মাতের শীর্ষস্থানীয় বহু আবেদ ও তাক্বওয়া দীপ্ত গোষ্ঠীকে পদস্খলিত করেছে। তারা ইসলাম থেকে পরিষ্কার বের হয়ে গেছে; যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়।

ক। অধিক ইবাদত করার পরও দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া [مروق من الدين على كثرة العبادة]:

আর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী প্রশাসনকে দীন ত্যাগী (মুরতাদ) ব্যক্তিদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে আমীরুল মুমিনীন আলী, আবু সাঈদ খুদরী, সাহল বিন হানীফ, আবু যর গিফারী, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, আব্দল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সহ প্রমুখ কর্তৃক বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারিজী সম্প্রদায়ের উল্লেখপূর্বক তাদের বিবরণীতে বলেছেন:

"يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وقراءته مع قراءتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"

তাদের ছ্বলাতের পাশে তোমাদের ছ্বলাত তোমাদের কাছেই নগন্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে। তাদের সওমের পাশে তোমাদের সওম তোমাদের কাছেই নগন্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে। তাদের কুরআন পাঠের পাশে তোমাদের কুরআন পাঠ তোমাদের নিকট নগন্য ও অপছন্দনীয় মনে হবে। তারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন ধনুক থেকে (দ্রুত) রেরিয়ে যায় তেমনি তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা কর অথবা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ

কর। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।[৩৩] অপর বর্ণনায় এসেছে:

"شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه"

আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত হলো এরাই।[৩৪] পক্ষান্তরে এদের হাতে যারা শহীদ হবে তারা হবে সর্বোত্তম নিহত। অন্য বর্ণনায় এসেছে:

لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ

খারিজীদের যারা হত্যা করে তারা যদি রসূলের ভাষায় তাদের জন্য যা বর্ণিত হয়েছে তা জানত, তাহলে তারা আমল করা হতে বিরত থাকত।[৩৫]

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত আমলে যখন ঐসব খারিজীদের আবির্ভাব ঘটে তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক ও তাদেরকে হত্যার প্রতি উৎসাহ দানের হাদীছের আলোকে ও সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতৈক্য অনুযায়ী আলী ও অন্যান্য ছাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাদেরকে হত্যা করেন। তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দ একমত হন।

এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে হত্যা করা হয় মুসলিমদের দল পরিত্যাগ কারীদেরকে (মুরতাদদেরকে)। আরো হত্যা করা হয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ও শরী'আতের বিরোধিতাকারী ও ভ্রান্ত প্রবৃত্তির পূজারী এবং বিদ'আতের অনুসারীদেরকে।

---

৩৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১০, ৩৩৪৪, ৭৪৩২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৬৪, ১০৬৬।
৩৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৬৭
৩৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৬৬, সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৭৬৮।

খ। এমন বাড়াবাড়ি যা কুফুরীর দিকে নিয়ে যায় [غلو يقود إلى الكفر]।

এরই ভিত্তিতে মুসলিমগণ রাফিযী সম্প্রদায়কেও হত্যা করে। কারণ, তারা ঐ (খারিজী) ভ্রান্ত দলের চেয়েও নিকৃষ্টতম। এরা তিন খলীফাসহ অন্যান্য শাসক ও শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে। তারা দাবী করে পৃথিবীতে কেবল তারাই ইমানদার বাকী সবাই কাফির। তারা আরো কাফির বলে থাকে সেসব মুমিন মুসলিমদেরকে যারা আল্লাহ তা'আলাকে আখিরাতে দেখতে পাবে বলে বিশ্বাস করে অথবা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী রয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তার জন্য পূর্নাঙ্গ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ইচ্ছা শক্তির গুণ সাব্যস্ত করে। তারা যে বিদ'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে তারা কাফির আখ্যায়িত করে।

তারা মোজা ছাড়াই দু'পা মাসাহ করে। তারা তারকা উদয় হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ছ্বলাত ও ইফতার বিলম্ব করে। বিনা কারণে দু'ওয়াক্তের ছ্বলাত একত্রিত করে পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতে সর্বদা কুনুতে নাযিলাহ বা বদ দু'আ পাঠ করে। মাশরুম জাতীয় খাবারকে হারাম মনে করে, ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের দ্বারা যবাইকৃত পশু ও তাদের ভিন্নমত পোষণকারী মুসলিমদের দ্বারা যবাই করা পশুর গোস্ত হারাম ভাবে। কারণ তাদের নিকট এরা সবাই কাফির।

তারা ছাহাবীদের বিষয়ে মারাত্মক কথা বলে- যা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এরূপ বিবিধ কারণে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের আলোকে মুসলিমগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

বাতিল ও ভ্রষ্টতার মূলনীতি [أصول الباطل والضلال]

যখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগে মুসলিমগণের সাথে সম্পৃক্তকারী কেউ কেউ বিশাল ইবাদত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, এমনকি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে প্রমাণিত হলো আধুনিক কালেও ইসলাম ও সুন্নাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো কোনো লোক ইসলাম ও সুন্নাহ হতে বেরিয়ে যাবে। এমনকি অনেকেই সুন্নাতের অনুসারী দাবী করবে কিন্তু তারা সুন্নাতের অনুসারী নয়; বরং তারা ইসলাম ও সুন্নাহ হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেছে। আর এর পশ্চাতে রয়েছে বহু কারণ।

সুন্নাহ হতে বের হওয়ার কারণ

১। **বাড়াবাড়ি (الغلو):** এ বাড়াবাড়ি হলো সেই অপরাধ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যার নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না, নিশ্চয়ই ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রসূল ও তার বাণী যা তিনি মারাইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, আর তার পক্ষ হতে নির্দেশ, অতএব তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর বলো না তিনজন (ইলাহ আছে), (তোমাদের ভ্রান্ত আক্বিদা থেকে) নিবৃত্ত হও, তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, নিশ্চয়ই এক আল্লাহই প্রকৃত ইলাহ, তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পূত পবিত্র। আসমানসমূহে আর যমীনে যা আছে সবকিছু তারই, আর আল্লাহই কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। *(সূরা আন নিসা ৪: ১৭১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾

বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের দীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৭৭)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ "

দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার কর। কারণ তোমাদের ইতিঃপূর্বের লোকেরা দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।[৩৬] হাদীছটি ছ্বহীহ।

২। **দলাদলি ও মতভেদ (التفرق والاختلاف):** যার আলোচনা আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বহুবার উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

৩। **জাল হাদীছের উপর আমল করা (أحاديث تروى):**

এগুলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত এমন হাদীছ যা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতৈক্য অনুসারে তার উপর অর্পিত মিথ্যাচার। মুর্খগণ ঐগুলো হাদীছ বলে শ্রবণ করে। আর ধারণা প্রসূতভাবে কু-প্রবৃত্তির চরিতার্থে তা সত্য বলে গ্রহণও করে।

৪। **পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছেঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ধারণার অনুগামী হওয়া।** যেমন- আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও ধারণার অনুগামীদের প্রসঙ্গে বলেছেন।

﴿إِن يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدَى﴾

তারা তো শুধু ধারণা আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের 'রব' এর পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে। *(সূরা আন নাজম ৫৩:২৩)*

---

৩৬. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩০২৯, নাসাঈ হা/৩০৫৭।
৩৭. সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫, সূরা আল আন'আম ৬:১৫৯।

আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসঙ্গে বলেন:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, আর সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। *(সূরা আন নাজম ৫৩:১-৪)*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি, যে দু'টি অজ্ঞতা ও যুলুম, সে দু'টি খারাপ গুণ থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পথভ্রষ্ট হলো সে ব্যক্তি যে হক জানে না। আর বিভ্রান্ত হলো সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বিবৃতি প্রদান করছেন এ মর্মে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রবৃত্তি হতে কোনও কথা বলেননি। বরং তা ছিল ওহী যা আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এখন আমি কিছু বাতিল পন্থীদের কতক মূলনীতি আলোচনা করব, যারা নিজেদের সুন্নাতের অনুসারী বলে দাবী করে। অথচ তারা সুন্নাত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং বড় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিথ্যা বানোয়াট হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা

[الاحتجاج بالأحاديث المكذوبة]

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বিষয়ে এমন কিছু হাদীছ বর্ণনা করে যা ইসলামের স্বর্ণযুগে সংকলিত হাদীছের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না, সে সব হাদীছ সম্পর্কে আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি ও জানি যে, তা মিথ্যা ও অপবাদ। এমনকি এটি নিকৃষ্ট কুফরী কর্ম। আবার তারা কুফরী কর্মের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু কথা বলে যে বিষয়ে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। যেমন তাদের বর্ণিত একটি হাদীছ:

"أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة"

নিশ্চয় আল্লাহ আরাফার দিনের সন্ধ্যা বেলা মাঠে উটের উপর সওয়ারী হয়ে আরাফায় অবতরণ করেন। আরোহণকারীদের সঙ্গে মুসাফা ও পদ ব্রজে চলমান ব্যক্তিদের সাথে কোলাকুলি করেন।"

এটি আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বড় ধরনের মিথ্যাচার ও অপবাদ। এ কথা যিনি বলেছেন, তিনি আল্লাহর প্রতি অপবাদকারীদের মধ্যে বড় অপবাদদাতা। মুসলিমদের কেউ এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেননি; বরং মুসলিম হাদীছ বিজ্ঞানী ও সর্ব শ্রেণীর আলিমদের মতৈক্য অনুযায়ী এটি রসূলের উপর একটি মিথ্যাচার। জ্ঞানীরা যেমন, ইবনে কুতাইবাহ ও অন্যান্যরা বলেন, এ হাদীছ বা এ ধরনের আরো যে সব জাল হাদীছ রয়েছে, সেগুলো আবিষ্কার করেছে যিনদীক তথা গোপন কাফির সম্প্রদায়; যাতে তারা হাদীছ বিজ্ঞানীদের কলংকিত করতে সক্ষম হয় এবং তারা বলতে পারে যে, তারাও এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেন। এরূপ আরেকটি হাদীছ হলো:

"أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف"

'মুযদালিফা থেকে যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন যে, তিনি হাজ্জব্রতকারীদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তার গায়ে ছিল পশমী জুব্বা'।

এরূপ বহু অপবাদ ও মিথ্যাচার তারা আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের উপর আরোপ করেছে, যা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল সম্পর্কে জানে এমন কোনো ব্যক্তি উচ্চারণও করতে পারে না। অনুরূপ আরেকটি হাদীছ হলো:

"أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه"

নিশ্চয় আল্লাহ পৃথিবীতে চলাচল করেন। যখন সবুজ স্থানে যান তখন তারা বলেন এটা আল্লাহর দু'পা রাখার স্থান। এ মর্মে নিম্ন আয়াতটি তারা দলিল হিসাবে পেশ করে থাকেন। আয়াতটি হলো:

﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্পর্কে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। *(সূরা আর রূম ৩০:৫০)*

আলিম সমাজের ঐকমত্য অনুযায়ী এটিও মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেননি যে, তোমরা আল্লাহর পদক্ষেপের ফলসমূহের প্রতি চিন্তা-ভাবনা কর। বরং তিনি বলেছেন:

"آثار رحمت الله"

'আল্লাহর রহমতের ফল সম্পর্কে'। এখানে রহমত অর্থ হলো বৃষ্টি। আর ফল অর্থ হলো উৎপন্ন বস্তুসমূহ: শস্য ও সবুজ তৃণলতা। অনুরূপভাবে তাদের বানানো হাদীছের আরো অংশ হলো:

"أن محمدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأي ربه في الطواف"

"মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 'রব'-কে ত্বওয়াফে দেখেছেন"

তাদের বানোয়াট হাদীছের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে:

"أنه رآه خارج من مكة"

'তিনি মক্কার বাহিরে আল্লাহকে দেখেছেন'।

তাদের বানোয়াট হাদীছের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে,

«أنه رآه في بعض سكك المدينة»

'মদীনার কোন কোন গলিতে তিনি তাকে দেখেছেন'।

এরূপ বহু বানোয়াট হাদীছ, যা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ছেড়ে দিলাম।

বস্তুত হাদীছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিম জাতির ঐক্যমতে ও আলিম

সমাজের মতৈক্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ মর্মে কোন হাদীছ মুসলিম মনীষীদের কেউই বর্ণনা করেননি।

তবে মিরাজে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন কি না এ মর্মে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস সহ আহলে সুন্নাতের বহু আলিম বলেছেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।

পক্ষান্তরে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সহ একটি দল পূর্বোক্ত অভিমত অস্বীকার করেছেন। তবে এ বিষয়ে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি এবং এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসাও কেউ করেননি।

এ বিষয়ে কতিপয় মুর্খরা আবু বকর ছিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক যে হাদীছটি বর্ণনা করে যে তিনি আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মিরাজে আল্লাহকে দেখেছেন, তিনি জবাবে বললেন হ্যাঁ, দেখেছি। অপর দিকে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেছেন, আমি দেখিনি।" আলিম সমাজের ঐক্যমতে এই হাদীছও মিথ্যা। এ ধরনের কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এ জন্যে ইমাম কাজী আবু ইয়া'লাসহ অনেক ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমদ কর্তৃক এ বিষয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।

(ক) মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার মধ্যে স্থাপিত দু'চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন এ কথা বলা যাবে কিনা?

(খ) নাকি বলা যাবে যে, তিনি অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন?

(গ) অথবা তিনি দেখেছেন তবে এ কথা বলা যাবে না যে, মাথার মধ্যে স্থাপিত দু'চোখ দ্বারা দেখেছেন বা অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।

অনুরূপভাবে ঐ হাদীছ পণ্ডিতগণ ইবনে আব্বাস ও উম্মে তুফাইলসহ অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

"رأيت ربي في صورة كذا وكذا"

"আমি আমার রবকে এইরূপ এইরূপ আকৃতিতে দেখেছি" সে হাদীছে রয়েছে-

"أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري"

'তিনি আমার দুই কাঁধের উপর তার হাত রাখলেন এমনকি তার আঙ্গুলসমূহের শীতলতা আমার বক্ষদেশে অনুভব করলাম'।

এ হাদীছ মিরাজের রজনীর হাদীছ নয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মদীনায়। কারণ হাদীছে এ পরিভাষা রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ফজরের ছ্বলাতে বাধাগ্রস্ত হলেন। তারপর ছাহাবীদের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি এরূপ এরূপ দেখলাম।

এ বর্ণনা এসেছে সে সব লোকদের থেকে যারা কেবল মদীনায় রসূলের পিছনে ছ্বলাত আদায় করেন। যেমন, উম্মে তুফাইল ও অন্যান্যরা। আর পবিত্র কুরআন, মুতাওয়াতির হাদীছ ও আলিমদের ঐকমত্য অনুসারে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে মক্কায়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে কোনো এক রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়। *সূরা বনী ইসরাইল* **১৭:১**

দীর্ঘ আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদীছটিতে যে স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে তা ছিল মদীনায় ঘুমের মধ্যে সংঘটিত স্বপ্ন। যেমনটি হাদীছের বহু সনদে বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়েছে যে, তা ছিল 'ঘুমের স্বপ্ন' অথচ নাবীদের স্বপ্নও ওহী। অতএব মিরাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় কোনো দর্শন ছিল না।[৩৮]

মুসলিমগণ একমত যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি। আর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কখনো দুনিয়াতে নেমে আসেননি।

আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কখনও কোনো হাদীছে এরূপ পরিভাষা আসেনি যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অবতরণ করেন। বরং প্রসিদ্ধ ছ্বহীহ হাদীছসমূহে এসেছে:

"أن الله يترل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له"

রাতের শেষের তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে এসে বলেন, যে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনা

৩৮. ইসরা ও মিরাজের পুরা ঘটনাটি রাতের শেষাংশে স্বল্প সময়ে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঘটেছিল। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ، أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ এটি ছিল প্রত্যক্ষ দর্শন, যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিরাজের রাতে সরাসরি দেখানো হয়েছিল। ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৭১৬।

কবুল করব। যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিয়ে দিব। আমার নিকট যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব[৩৯]। ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে-

"أن الله يدنو عشية عرفة"

'আরাফার দিনে বিকেল বেলায় আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন'। অপর বর্ণনায় এসেছে,

"إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء"

পৃথিবীর নিকটতম আসমানে আসেন। তারপর আরাফাবাসীদের বিষয়ে ফিরিস্তাদের সঙ্গে গর্ববোধ করেন। তাদেরকে বলেন, দেখ আমার বান্দারা এলোমেলো চুল, ধুলায় ধুসরিত অবস্থায় আমার নিকট এসেছে। তারা আমার নিকট কি প্রত্যাশা করে?

আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখে অবতরণ করেন, যদি হাদীছটি ছ্বহীহ হয়। কিন্তু হাদীছ যাচাই বাছাইকারী বিজ্ঞানীগণ হাদীছটির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

অনুরূপভাবে কেউ কেউ বর্ণনা করেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন একদা আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীনের মাঝখানে একটি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হয়ে রসূলের সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। আহলে ইলম এর ঐকমত্য মোতাবেক এ হাদীছটিও সম্পূর্ণ ভুল।

বরং ছ্বহীহ হাদীছ সমূহে এটাই এসেছে যে, সে ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যিনি হেরা গুহায় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এসে বলেছিলেন,

"فقال له: اقرأ فقلت: لست بقارئ فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت: لست بقارئ فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال"

তুমি পড়! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বলছি, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে ধরে নেন এবং চাপ দিলেন যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলছেন, তুমি পড়, আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে আবারো ধরে নেন এবং চাপ দিলেন যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, বল

---

৩৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৫৮।

﴿اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِيْ عَلَّمَ بِالقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ﴾

তুমি পড়! তোমার 'রব' এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে আলাক (জমাট রক্ত) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পড়! তোমার রব সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানত না। *(সূরা আল আলাক ৯৬: ১-৫)*

এটাই হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ প্রথম ওহী। তারপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী নাযিল হওয়ার বিরতি সম্পর্কে বলেন,

"فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً فرفعت رأسي فإذا هو الملك الذي جاءني بحراء أراه جالسا على كرسي بين السماء والأرض"

আমি হেটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা উত্তোলন করলাম। দেখলাম ঐ জিব্রীল ফেরেস্তা যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন। তাকে আসমান ও যমীনের মাঝে একটি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম।[৪০]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত আছে- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আসমান ও জমীনের মাঝে উপবিষ্ট হেরা গুহায় আগত ফেরেস্তাই হলেন ইনি। তারপর তাকে দেখে তিনি যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করলেন।

কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় মালাক-ফেরেশতা শব্দটি এসেছে, কিন্তু পাঠক পড়ছেন মালিক-আল্লাহ, অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উপবিষ্ট ছিলেন ফেরেস্তা জিব্রীল আলাইহিস সালাম।[৪১]

সারকথা হলো, যে সব হাদীছে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার পদাঙ্কসমূহ হলো জান্নাতের বাগিচা, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাস এর আঙ্গিনায় চলাচল করেছেন। এ সবই হলো আহলে হাদীছ তথা হাদীছ বিশারদগণ সহ সকল মুসলিমের ঐকমত্য অনুযায়ী মিথ্যা ও বাতিল।

অনুরূপভাবে যে দাবী করে, সে আল্লাহ তা'আলাকে মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ্যে স্বচক্ষে

৪০.ছ্বহীহ বুখারী হা/৪
৪১.ছ্বহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

দেখেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা অনুযায়ী তার দাবীও বাতিল। কারণ, সকল মুসলিম এ বিষয়ে একমত যে, মৃত্যুর পূর্বে কেউ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারবে না।

বিষয়টি নাওয়াস ইবনে সাম'আন কর্তৃক ছুহীহ মুসলিমে দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন,

"واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت"

তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে তার 'রব'-কে দেখতে পাবে না।[৪২]

এ মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যাতে রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় জাতিকে দাজ্জালের ফিৎনা বিষয়ে সর্তক করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। সুতরাং কেউ দাজ্জালকে দেখে এ ধারণা না করে যে, তিনি আল্লাহ।

তবে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ের বিষয়ে ঈমানদারদের অন্তরে এমন গুণ সন্নিবেশিত হয় যে, তাদের হৃদয়ের গভীর প্রত্যয়, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্যে হৃদয়ের চোখে আল্লাহর দর্শন লাভ মনে করার বহু স্তর রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম স্তর হলো ইহসান।

হাদীছে জিব্রীলে ইহসান সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিব্রীল আলাইহিস সালাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

" الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يرَاكَ "

ইহসান হলো তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যাতে মনে হয় তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে অবশ্যই মনে করবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন।[৪৩]

কখনো কখনো মুমিনরা স্বপ্নে তাদের ঈমানের স্তর অনুযায়ী আল্লাহকে বিভিন্ন আকৃতিতে দেখতে পাবেন। তাদের ঈমান যদি ভালো হয়, তবে ভালো আকৃতিতে তাকে দেখতে পাবেন। আর তাদের ঈমান যদি খারাপ হয় তবে খারাপ আকৃতিতে দেখতে পাবেন। স্বপ্নে দেখার বিধান আর বাস্তবে দেখার বিধান এক নয়। কারণ

৪২.ছুহীহ মুসলিম হা/২৯৩১
৪৩. ছুহীহ বুখারী হা/৪৭৭৭।

স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে এবং স্বপ্নে মানুষ বাস্তব বস্তুর বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি দেখতে পায়।

অনেক মানুষ এমন আছে জাগ্রত অবস্থায়ও তার অন্তরে স্বপ্নে দেখার মতো বিভিন্ন জিনিস ভেসে উঠতে পারে। তখন সে অন্তর দিয়ে ঘুমন্ত লোকের মতো অনেক কিছুই দেখতে পায়। কখনো কখনো তার অন্তর দিয়ে দেখা বিষয় বাস্তব দেখা বলেই মনে হয়, এগুলো সবই দুনিয়াতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আবার কখনো কখনো তাদের কেউ কেউ সে সব বস্তু অন্তর দিয়ে দেখছে ও ইন্দ্রিয় দিয়ে একত্রিত করছে তা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে সে মনে করে যে, সে তো এটা তার দু'চোখ দিয়েই দেখছে। অতঃপর যখন জাগ্রত হয়, তখন বুঝতে পারে যে সে তো স্বপ্নে তা দেখছে। আবার কখনো কখনো স্বপ্নেও বুঝতে পারে যে আসলে তা স্বপ্ন।

সুতরাং ইবাদতকারী লোকদের কাউকে দেখা যাবে যে, যার এ ধরনের হৃদয়ের দর্শন এমন প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে যে সে সম্পূর্ণরূপে অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়ে। তখন সে মনে করে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অথচ সে ভ্রান্তিতে আছে। পূর্বের বা পরবর্তী যুগের যে সব মনীষীরা আল্লাহকে এ ধরনের স্বচক্ষে দেখার দাবী করে থাকে, উম্মাতের জ্ঞানী ও ঈমানদার সবার মতে সে ভ্রান্তিতে নিপতিত।

জান্নাতে মুমিনরা তাদের প্রভুকে দেখবেন

[رؤية المؤمنين ربهم في الجنة:]

হ্যাঁ, মুমিনগণ জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। অনুরূপ এটি সংঘঠিত হবে কিয়ামতের মহা ময়দানে। এটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অকাট্য হাদীছসমূহ দ্বারা সু-প্রমাণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب"

নিশ্চয়ই তোমরা অতি তাড়াতাড়ি তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে দ্বি-প্রহরে সূর্য দেখতে পাও, যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র দেখতে পাও।[৪৪]

---

৪৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৩৯ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

جِنَانُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ: ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ،

ফিরদাউসের বাগানসমূহ চারটি; দু'টি জান্নাত স্বর্ণের, তার পাত্র ও তাতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণের। আর দু'টি জান্নাত রূপার, তার পাত্র ও তাতে যা কিছু আছে তাও রূপার। জান্নাতীতের মাঝে এবং রবকে দেখার মাঝে বাধা জান্নাতে 'আদনে একমাত্র তার চেহারার বড়ত্বের চাদর'।[৪৫] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

"إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ نادي منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويُجِرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة"

'যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন একজন আহ্বানকারী বলবেন, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে আপনাদের একটি প্রতিশ্রুতি আছে। তিনি তা আপনাদেরকে প্রদান করবেন। জান্নাতবাসীগণ বলবেন সেটি আবার কি! আমাদের চেহারা কি উজ্জল হয়নি! আমাদের আমলনামা কি ভারী হয়নি! আমাদেরকে কি জান্নাত দেননি! এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি! এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পর্দা উঠে যাবে। তারা তাকে দেখবে। এমনকি তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রিয় হবে আল্লাহর দর্শন লাভ। আর এটি অতিরিক্ত।[৪৬]

৪৫. যঈফ: মুসনাদে আহমাদ ১৯৭৩১
৪৬. ছ্বহীহ মুসলিম ১৮১/২৯৭

মু'তাযিলা ও রাফিযীদের অবস্থান [موقف المعتزلة والرافضة]

উপরোক্ত হাদীছসমূহ ছ্বহীহ হাদীছ গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে। পূর্ববর্তী আলিম সমাজ ও ইমামগণ এ হাদীছগুলো গ্রহণ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হাদীছগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। শুধুমাত্র জাহমীয়া সম্প্রদায় [الجهمية] ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলা [المعتزلة], রাফিযী [الرافضة] ও অনুরূপ আক্বীদাপন্থী দলের লোকেরাই বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, দর্শনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করেছে। এরাই হলো নির্গুণবাদী মু'আততিলাহ; সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব।

আল্লাহর দীন ইসলাম মধ্যবর্তী দীন, যাতে কোনো বাড়াবাড়ি নেই আর কোনো হঠকারিতাও নেই। উভয় বাতিল সম্প্রদায়; এক- যারা আখিরাতে আল্লাহর দর্শন লাভ বিষয়ক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছসূহকে অস্বীকার করে, দুই- যারা বাড়াবাড়িকে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে দুনিয়াতে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার দাবী করে- এ উভয় দলের মাঝামাঝিতে ইসলামের অবস্থান। বাকী উভয় দলই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারীদের অবস্থান

[موقف الغلاة في الرؤية]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা অনুযায়ী আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভকে মিথ্যা মনে করা, চরমপন্থীদের দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার দাবীকে সত্য বলে মনে করা, এ দু'টির মাঝামাঝি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার দীন। এ দুটি আক্বীদাই বাতিল। এসব লোকদের কারো কারো দাবী যে, সে পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছে। এরাও পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় পথভ্রষ্ট। যদি তারা কোন সৎপরায়ণ ব্যক্তি অথবা সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র প্রধান কিংবা অন্য কোন ধরণের মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দাবি করে তাহলে তাদের পথভ্রষ্টতা ও কুফরী আরো মারাত্মক হবে। তখন তারা ঐসব খ্রিষ্টানদের থেকেও অধিক পথভ্রষ্ট যারা দাবী করেছিল যে, তারা আল্লাহকে ঈসা ইবনে মারইয়ামের আকৃতিতে দেখেছে।

এরা হলো শেষ যামানার দাজ্জালের অনুচর পথভ্রষ্টকারীর চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধিক গোমরাহ। দাজ্জাল মানুষকে বলবে আমি তোমাদের রব, সে আসমানকে নির্দেশ দিবে, অতঃপর বৃষ্টি প্রবাহিত হবে এবং জমিনকে নির্দেশ দিবে, অতঃপর সুজলা-সুফলা ফসল উৎপাদিত হবে। সে অনাবাদি জমিকে বলবে তোমার ভিতর প্রোথিত সম্পদ বের করে দাও সঙ্গে সঙ্গে জমি তা বের করে দিবে। এভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাতিকে দাজ্জাল বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন। রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ما من خلق آدم إلى يوم القيامة فتنة أعظم من الدجال

আদম সৃষ্টি থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সবুজ শস্য শ্যামল পৃথিবীতে যত ফিতনার ঘটনার অবতারণা হবে তার মধ্যে দাজ্জালের ঘটনাই হবে সবচেয়ে বড় ফিতনা।[৪৭] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذبك من عذاب جهنم، وأعوذبك من عذاب القبر، وأعوذبك من فتنة المحيا والممات، وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ছ্বলাতের সমাপনী বৈঠকে বসে তখন সে যেন চারটি বিষয় হতে মুক্তির জন্যে আশ্রয় চেয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি, কবরের সাজা হতে নিষ্কৃতির জন্যে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জীবন ও মরণের পরীক্ষার বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি এবং মাসীহ দাজ্জালের পরীক্ষা হতে বাঁচার জন্যে তোমার দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা করছি।[৪৮] এ দাজ্জাল রুবুরিয়্যাহ দাবী করবে এবং কিছু সংশয় বিষয় নিয়ে আসবে যদ্দারা মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ও আল্লাহ তা'আলার দাবীদার দাজ্জালের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " **إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ** " জেনে রাখ! দাজ্জাল হবে কানা, আর তোমাদের আল্লাহ কানা নন।[৪৯]

তিনি আরো বলেছেন, তোমরা ভালোভাবে জেনে রেখ! তোমাদের মধ্যে কেউই কখনোই মৃত্যুর পূর্বে তার আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। উম্মতের জন্যে উপরোক্ত দু'টি প্রকাশ্য আলামত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। মানুষ সে দু'টি চিহ্নের মাধ্যমে মিথ্যা আল্লাহ তা'আলার দাবীদার

---

৪৭. তাবারানী মু'জামুল কুবরা ৪৫১, আওসাতে কাবীর ৩৩৬।

৪৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩২, মুসলিম ৫৮৮, তিরমিযী ৩৪৯৪, ইবনে মাজাহ ৯০৯, নাসাঈ ১৩০৯

৪৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৩১, মুসলিম হা/২৯৩৩, তিরমিযী হা/২২৪৫, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান ৬৭৮০

দাজ্জালকে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। কারণ দাজ্জালের পরীক্ষায় যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা জায়েয বলবে। যেমন, ঐসব বিভ্রান্তকারী পথভ্রষ্ট যাদের নাম করা হয় সর্বেশ্বর-বাদী [الحلولية] ও অদ্বৈতবাদী [الاتحادية]। [তারা প্রধানত এ দু'টি ভাগে বিভক্ত। এ প্রকৃতির লোকেরা আল্লাহ তা'আলাকে কতিপয় বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদ মনে করে।]

সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা পোষণকারীদের প্রকার

[أصناف الغلاة الحلولية]

তারা দু'প্রকার:

ক। **প্রথম শ্রেণী:** এ সম্প্রদায়ের লোক এমন আছে যারা আল্লাহ তা'আলাকে কতিপয় বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদে বিশেষিত করে। যেমন, খ্রিষ্টানগণ ঈসা আলাইহিস সালাম এর মধ্যে ও চরমপন্থীরা আলী (রা.) ও তার সমমান লোকদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে। অপর কিছু লোক পীর, মাশাইখদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আছে বলে বিশ্বাস করে। আর কিছু লোক রাজা বাদশাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আছে বলে বিশ্বাস করে। আর কিছু লোক সুন্দর সুন্দর ছবির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আছে বলে বিশ্বাস করে। ইত্যাদি ভ্রান্ত কথা-বার্তা রয়েছে যেগুলো খ্রিষ্টানদের কথার চেয়েও নিকৃষ্ট।

খ। **দ্বিতীয় শ্রেণী:** এ শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ তা'আলাকে সব বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদ বলে। এমনকি তারা সকল অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান মনে করে। এমনকি তারা বিশ্বাস করে কুকুর, শূকর, অপবিত্র বস্তুসহ অন্যান্য সবকিছুতে আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান। এটি জাহমীয়া সম্প্রদায় ও তাদের মতাবলম্বী এবং অদ্বৈতবাদী মত। যেমন, ইবনে আরাবী, ইবনে ফারিদ্ব, ইবনে সাব'ঈন, তিলমসানীও বালয়ানী প্রমুখের অনুসারীদের বিশ্বাস।

অথচ সকল রসূল, তাদের অনুসারী মুমিন ও আহলে কিতাব-এর মাযহাব হলো আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যকার সব কিছুর রব, মহা আরশের রব, সকল সৃষ্টি তারই। তারা তার প্রতি মুখাপেক্ষী। মহা মহিম পবিত্র আল্লাহ তা'আলা আসমানের আরশের উপর অধিষ্ঠিত। সৃষ্ট জীব থেকে তিনি অনেক দূরে। এতদসত্বেও তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই

রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন। *(সূরা আল হাদীদ ৫৭:৪)*

সীমালঙ্ঘনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের শাস্তি [عقوبة الغلاة أهل الضلال]

ঐ সব কাফির পথভ্রষ্টরা, যাদের কোনো একজন দাবী করে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্য দেখেছে অথবা কখনো কখনো এ দাবী করে যে, সে আল্লাহর সাথে বসেছে, তার সাথে কথা বলেছে, তার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছে অথবা আল্লাহ তা'আলা সবার সঙ্গে আছেন। এ সকল দাবী যারাই করবে তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তারা তাওবা করে ভালো, নতুবা ইসলামী আইনে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। এ ধরনের লোকেরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের চেয়েও বড় কাফির। ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানগণ কাফির এ জন্যে যে, তারা বলে মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ তা'আলা। প্রকৃতপক্ষে মাসীহ হলো সম্মানিত রসূল। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদেরও অন্যতম। সুতরাং তারা যখন এ আক্বীদা পোষণ করে 'ঈসা আলাইহিস সালাম-ই আল্লাহ এবং আল্লাহ ও ঈসা আলাইহিস সালাম একাকার হয়েছেন অথবা আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন'। তখন তাদের কুফরী নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের কাফির হওয়া আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। বস্তুতঃ তারা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা বলেছে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাদের বিভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۞ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে।' তোমরা তো এক ভয়ানক বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশ সমূহ ফেটে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। কারণ তারা রহমানের উপর সন্তান আরোপ করে অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্যে শোভা পায় না। আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে বান্দা রূপে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে না। *(সূরা মারইয়াম ১৯:৮৮-৯৩)*

অতএব সে লোকের কি হবে, যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাউকে আল্লাহ তা'আলা বলে দাবী করে? বরং সে চরমপন্থী মতবাদের লোকদের চেয়েও বড় কুফরী করেছে? যারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অথবা বিশ্ব নাবী মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার ভুক্ত কাউকে আল্লাহ বলে দাবী করত। বস্তুত এরাই সে সব যিন্দিক বা প্রচ্ছন্ন কাফির-মুনাফিক, যাদেরকে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তিনি গর্ত করার নির্দেশ দিলেন, কিন্দা দরজার কাছে তা খনন করা হলো। তিনদিন পর্যন্ত তাদেরকে সময় দিয়েছেন তাওবা করার জন্যে। যারা তাওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। যারা তাওবা না করে স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর অটল ছিল তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা করা হয়েছিল। তাদের হত্যার বিষয়ে সকল ছাহাবী একমত ছিলেন। কিন্তু হত্যার ধরন নিয়ে পরস্পর দ্বিমত ছিল। বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অভিমত ছিল আগুনে না পুড়িয়ে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হোক। আর এটাই সকল আলিমের অভিমত। আর এটি আলিমদের নিকট একটি পরিচিত ঘটনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নেককার লোকদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি ধ্বংসের মূল [الغلو في الصالحين]

অনুরূপভাবে ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হচ্ছে, কতিপয় শাইখের বিষয়ে অতিভক্তি, সীমালঙ্ঘন ও অতি বাড়াবাড়ি করা, চাই তা শাইখ আদী অথবা ইউনুস কানবি, মানছুর হাল্লাজ অথবা অনুরূপ যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে হোক। এমনকি মহান খলিফা ও বিশিষ্ট ছাহাবী আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও শীর্ষস্থানীয় নাবী ঈসা আলাইহিস সালাম এর বিষয়ে বাড়াবাড়িও একই পর্যায়ভুক্ত।

যে ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট নাবী অথবা পুণ্যবান ব্যক্তির ব্যাপারে যেমন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অথবা আদী অথবা অন্য কেউ অথবা অনুরূপ কোন ব্যক্তি যাকে নেককার মনে করা হয়, যেমন হাল্লাজ, মিশরের শাসক হাকিম লি আমরিল্লাহ (তথাকথিত ফাতেমী শাসক), ইউনুস কানাবী অথবা এ ধরনের অন্য যে কোনো মানুষের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলো এবং তার মধ্যে ইলাহ এর কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে করলো। যথা- এ কথা বলল যে, উমুক পীর বা শাইখের ইচ্ছা মোতাবেক প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য দেয়া হয় অথবা বকরী যবাইয়ের সময় বলে- আমার নেতার নামে, আমার বাবা ও পীরের নামে জবাই দিলাম অথবা সাজদার মাধ্যমে তার বা তার মতো কোন মাখলুকের ইবাদত করল অথবা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকে ডাকল, যেমন এভাবে বলা- হে আমার উমুক অভিভাবক আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে রিযিক দাও, আমাকে পরিত্রাণ দাও, আমাকে মুক্তি দাও অথবা একথা বলা যে, তোমার উপরই আমি নির্ভরশীল, তুমিই আমার জন্যে যথেষ্ট অথবা এ ধরনের সব কথা ও কর্ম যেগুলো রবের বৈশিষ্ট্য; আর যে সব কথা ও কর্ম কেবল আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য প্রযোজ্য নয়, এমন কিছু করল তখন তা সবই শিরক ও ভ্রষ্টতা বলে গণ্য হবে। তখন ঐ ব্যক্তির উপর তাওবা জারী করতে হবে। যদি তাওবার নির্দেশ পাওয়ার পরও তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে তবে ইসলামী প্রশাসনের রায় অনুযায়ী তাকে হত্যা করতে হবে।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, তার সঙ্গে যেন শরীক করা না হয়, যেন তার সঙ্গে অন্য কিছুকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ না করা হয়।[৫০]

---

৫০. এগুলো সবই ইবাদত যা কেবল এক আল্লাহর জন্য নিবেদন করা হবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এবং তার নাবী বর্ণনা করেছেন। জবেহ করা ইবাদত হওয়ার প্রমাণ, [সূরা আল-আন'আম, আয়াতঃ ১৬২-১৬৩] অনুরূপভাবে দু'আও ইবাদত। যে সব বিষয়ের সমাধান করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রাখে না তা কোন মাখলুকের কাছে চাওয়া, চাই তা সুপারিশকারী

আর যারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্যান্য ইলাহগুলো ডাকে, যেমন-সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উযাইর, ঈসা, ফেরেশতামণ্ডলী, লাত, উয্যা, মানাত, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাছর (প্রভৃতিকে ইলাহ হিসাবে ডাকে) যদিও তারা ঐ গুলোকে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী অথবা উদ্ভিদ ও শস্য উৎপাদনকারী স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে না (তবুও তারা মুশরিকদের মধ্যে গণ্য)।

বস্তুতঃ তারা ফেরেশতামণ্ডলী, নাবীগণ, জিন্ন, নক্ষত্ররাজি, নির্মিত মূর্তিসমূহ এবং কবরবাসীর ইবাদত এ জন্য করে যে, তারা ওদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তারা বলে, তারা আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী হবে।

নাবী ও রসূলগণের তাওহীদ [توحيد الرسل والأنبياء]

আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ও রসূলদের প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন, ইবাদতের ডাকও নয় এবং সাহায্যের ডাকও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ادْعُواْ الَّذِيْنَ زَعَمْتُم مِّن دُونِه فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلاً، أُولَـئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا﴾

বল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, (তাদেরকে আহ্বান করলেও দেখবে) তারা তোমাদের দুঃখ-বেদনা দূর করতে বা পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। তারা যাদেরকে আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের 'রব' এর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তার দয়া প্রত্যাশা করে ও তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার 'রব' এর শাস্তি ভয়াবহ। *(সূরা বনী ইসরাইল ১৭: ৫৬-৫৭)*

পূর্বসূরি এক দল আলিম বলেন, প্রাচীনকালে কিছু লোক ছিল যারা মাসীহ, উযাইর ও ফেরেশতাগুলীকে ডাকতো, আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন, তোমরা যেমন আমার

হিসাবে চাওয়া হোক বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই চাওয়া হোক তা অবশ্যই শিরক। সুতরাং দু'আ যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

নিকট নৈকট্য চাও তোমরা যাদেরকে ডাকছো তারাও তেমনি আমার নৈকট্য চায়, তোমরা যেমন আমার রহমত চাও তারাও আমার নিকট রহমত চায়। তোমরা যেমন আমার আযাবকে ভয় কর তারাও আমার আযাবকে ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ، وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾

বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও কোন কিছুর মালিক নয় এবং এ দু'য়ে তাদের কোনও অংশ নেই, আর তাদের কেউ আল্লাহ্র সাহায্যকারীও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। *(সূরা আস সাবা ৩৪: ২২-২৩)*

মহান পবিত্র আল্লাহ অবহিত করছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন শক্তিকে ডাকা হচ্ছে যাদের আল্লাহ তা'আলার রাজত্বে অনুপরিমাণ ক্ষমতা ও অংশীদারীত্ব নেই, সৃষ্টি বিষয়ে তাদের কোন ক্ষমতাও নেই যার দ্বারা সাহায্য করবে। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তার নিকট কারো সুপারিশ উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَم مِّنْ مَّلَكٍ فِيْ السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضَى﴾

আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেবেন। *(সূরা আন নাজম ৫৩: ২৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদেরকে নিজেদের মুক্তির জন্য) সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? বল, তারা কোন কিছুর মালিক না হওয়া সত্ত্বেও এবং তারা না বুঝলেও? বল, যাবতীয় সুপারিশ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা আয যুমার ৩৯: ৪৩-৪৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আকাশ সমূহে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে অনেক উর্ধ্বে। *(সূরা ইউনুস ১০: ১৮)*

তাওহীদই হলো নাবী-রসূলদের দাওয়াতের চাবি
[التوحيد مفتاح دعوة الرسل]

দীনের মূল বিষয় হলো এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। আর ঐটাই হলো তাওহীদ যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ﴾

তোমার পূর্বে আমি যে সকল রসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি (আল্লাহ তা'আলা) কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদত করা যায়? *(সূরা আয যুখরুফ ৪৩:৪৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوْتَ﴾

আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত ও ত্বগূতকে (সীমালঙ্ঘনকারী) বর্জনের দাওয়াত দিবে। *(সূরা আন নাহল ১৬:৩৬)*
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

আপনার পূর্বে আমি কোন রসূলকে এ ওহী ব্যতীত প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর। *(সূরা আম্বিয়া ২১: ২৫)*

তাওহীদের বাস্তবায়ন ও সব ধরনের শিরকের অণু-কণা থেকে সতর্ক করণ [تحقيق التوحيد والتحذير من كل مظاهر الشرك]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদকে বাস্তবায়ন করেন ও উম্মাতকে তা শিক্ষা দেন। তাই জনৈক ব্যক্তি যখন তার সামনে বলেছিল আল্লাহ তা'আলা যা চান ও আপনি যা চান। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে বলেছিলেন,

"أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده"

তুমি কি আমাকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করছ? বরং আল্লাহ এককভাবে যা চান তাই হয়।[৫১] তারপর বললেন,

"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد"

তুমি এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান ও মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান। বরং বলবে, আল্লাহ যা চান অতপর মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চায়।[৫২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন:

" مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ "

যে শপথ করতে চায় সে আল্লাহর নামে শপথ করবে অথবা নিরব থাকবে।[৫৩]
তিনি আরো বলেন:

"من حلف بغير الله فقد أشرك"

যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শিরক করল।[৫৪] তিনি আরো বলেন,

"لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"

---

৫১. ছ্বহীহ: আহমাদ, ইবনে মাজাহ হা/২১১৭
৫২. ছ্বহীহ: আহমাদ, ইবনে মাজাহ হা/২১১৮
৫৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৭৯।
৫৪. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩২৫১।

তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন করে খ্রিষ্টানগণ ইবনে মারইয়ামের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিশ্চয়ই আমি একজন বান্দা। অতএব তোমরা বল, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল।[৫৫]

এ কারণে আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি কোন সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করতে পারবে না। যথা- কা'বা ও অন্যান্য বস্তুর নামে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সাজদা করতেও নিষেধ করেছেন। কোনো কোনো ছাহাবী তাকে সাজদা করতে চাইলে তিনি তাদের নিষেধ করেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "**لا يصلح السجود إلا الله**" আল্লাহ ছাড়া সাজদা পাওয়ার উপযোগী কেউই নেই।[৫৬] তিনি আরো বলেন,

"**لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها**"

আমি যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাজদা দেয়ার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে।[৫৭]

রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -কে বলেন,

"**أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟**"

তুমি যদি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম কর তাহলে কি কবরকে সাজদা দিবে? তিনি বললেন, না।[৫৮]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "**فلا تسجد لي**" আমাকে সিজদা করবে না।[৫৯] এ জন্য কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় বলেন,

"**لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد**"

আল্লাহ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন, কারণ তারা নাবীদের কবরসমূহকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছে।[৬০] তারা যে কাজ করছে তা হতে তিনি

---

৫৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।
৫৬. সুনানে তিরমিযী
৫৭. হাসান, ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১১৫৯।
৫৮. সুনানে আবূ দাউদ
৫৯. সুনানে আবুদাউদ
৬০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩০।

উম্মাতকে সর্তক করে দিয়েছেন।

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যদি আশঙ্কা না হতো তাহলে ঘরের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে তার কবর দেয়া হত কিন্তু মানুষ মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে এ সম্ভাবনায় তিনি তা অপছন্দ করেছেন।[৬১]

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছেন:

إن من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك

তোমাদের পূর্বের লোকেরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদের এ বিষয়ে নিষেধ করলাম।[৬২] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে উপাসনার মূর্তি বানিয়ে দিও না। আল্লাহর গযব ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকট হয়, যারা নাবীদের কবরসমূহকে মসজিদ রূপে (ইবাদতের স্থান) গ্রহণ করেছে।[৬৩] তিনি আরো বলেন,

"لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليّ حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني"

তোমরা আমার ঘরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর দরুদ পাঠ কর । কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছবে।[৬৪]

এ কারণে পৃথিবীর সকল আলিম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ শরীয়ত সম্মত নয় এবং এর নিকট ছ্বলাত পড়াও ইসলামী বিধি সম্মত নয়। বরং ইসলামের শীর্ষ স্থানীয় আলিম ও নেতৃবর্গের অভিন্ন সিদ্ধান্ত যে, কবরের পার্শ্বের ছ্বলাত ইবাদত হিসাবে গৃহিত হবে না, বরং তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে।

মুসলিমদের কবর যিয়ারত করা, দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সমমর্যাদা সম্পন্ন লোকের নেতৃত্বে তাদের জানাযার ছ্বলাত সম্পাদন করা সুন্নত। আল্লাহ মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলেন:

---

৬১. ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বলাত অধ্যায়।
৬২. জামে মুসনাদ ২/৫৯৫।
৬৩. আহমাদ ২/২৪৬।
৬৪. আহমাদ ২/৩৭৬ ও আবুদাউদ হা/২০৪২

﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴾

তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনোই তুমি তার জানাযার ছ্বলাতে দাঁড়াবে না ও তার কবরের কাছে দাঁড়াবে না। *(সূরা আত তাওবা ৯:৮৪)*

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ মুমিনগণের কবরের উপর তাদের জন্য জানাযার ছ্বলাত আদায় করা যাবে এবং তাদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়ানো যাবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদেরকে কবর যিয়ারতকালীন নিম্নোক্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন-

"السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم"

হে গৃহসমূহের অধিবাসী মুমিনগণ, আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমরাও ইন্‌শা আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করুক। আমাদের ও আপনাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তাদের প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না, তাদের পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিও না। আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।[৬৫]

আর এটা এজন্যই যে, মূর্তিপূজার কারণসমূহের অন্যতম কারণ হলো কবরকে সম্মান প্রদর্শন করা, সেখানে ইবাদত ও অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

তারা বলল, তোমরা তোমাদের ইলাহদেরকে ছেড়ে দিও না। ছেড়ে দিও না ওদ্দা, সুয়া'আ, ইয়াগুসা, ইয়া'উকা ও নাছরা (নামক মূর্তিদেরকে)। *(সূরা নূহ ৭১:২৩)*

সালাফদের একটি দল বলেন, এসব নামে বর্ণিত লোকেরা সমকালীন জাতির ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। যখন তারা মারা গেলেন তখন তারা তাদের কবরের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ল। তারপর তাদের ভাস্কর্য, প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে তাদের ইবাদত করা শুরু করল।

---

৬৫. যঈফ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৮০১, ইবনে মাজাহ হা/১৫৪৬।

তাই আলিমদের ঐকমত্য সংঘঠিত হয়েছে, যে লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাম করতে চায় সে তার কবরের পাথর স্পর্শ ও চুমু দিতে পারবে না। কারণ চুমা দেয়া ও স্পর্শ করা বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর কাবার রুকন বা কোণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আল্লাহর ঘরকে মানুষের ঘরের সঙ্গে সাদৃশ্য করা যাবে না।

অনুরূপভাবে কবরে ত্বওয়াফ, ছ্বলাত ও ইবাদতের জন্য সমবেতও হওয়া যাবে না। বস্তুতঃ ত্বওয়াফ, ছ্বলাত ও ইবাদত করা আল্লাহর ঘর সমূহের অধিকার। আর সেগুলো ঐ মসজিদসমূহ; যাতে উচ্চস্বরে আযানের মাধ্যমে আল্লাহর নাম প্রচারের জন্যে, আল্লাহর যিকরের জন্য আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন। মানুষের ঘর (কবর) সমূহে উপরোক্ত ইবাদত বৈধ হবে না। কারণ তা করলে ঈদ হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا "

তোমরা আমার ঘরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না।[৬৬]

৬৬. ছ্বহীহ: সুনানে আবু দাউদ হা/২০৪২, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৪৮৩৯।

তাওহীদের গুরুত্ব [مكانة التوحيد]

এগুলো হলো তাওহীদকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যা দীনের মৌলিকত্ব ও দীনের মূল। এগুলো ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কারো আমল কবুল করেন না। তাওহীদের বাস্তবায়নকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন; কিন্তু তাওহীদ বর্জনকারীকে ক্ষমা করবেন না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। *(সূরা আন নিসা ৪:৪৮)*

এ কারণে তাওহীদের কালিমা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট বাক্য। এর মহা নিদর্শন আল কুরআনের আয়াতুল কুরসী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اللهُ لاَ إِلــهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُه" سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা (ঘুম) স্পর্শ করে না। *(সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"

যার শেষ কালিমা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৭]

ইলাহ হলো ঐ মহান সত্তা যার দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, তার ইবাদতের জন্য, তার সাহায্য কামনায়, তার আশায়, তার ভয়ে, তার সম্মানে ও ইজ্জতে।

---

৬৭. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩১১৬।

পরিচ্ছেদ

সুন্নাহ তথা আদর্শ অনুসরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

الاقتصاد في السنة (الاعتقاد)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সুন্নাহ (আদর্শ) অনুসরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, কোনো প্রকার কম-বেশী করা ছাড়া যেভাবে সুন্নাহ বর্ণিত হয়েছে সেভাবে তার অনুসরণ করা। যেমন, কুরআনে কারীম ও আল্লাহর গুণাবলীসমূহের ব্যাপারে তাদের কথা বা মত।

কুরআনুল কারীম বিষয়ে সালাফীদের (পূর্বসূরীদের) মাযহাব

[مذهب السلف في القرآن الكريم]

কারণ, এ উম্মাতের সঠিক পূর্বসূরী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, অবতীর্ণ বাণী যা সৃষ্ট বা মাখলুক নয়, এটি আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। এ কথাই পূর্বসূরী আলীমগণ বলেছেন। সুফীয়ান ইবনে 'উয়াইনা 'আমর ইবনে দীনার- যিনি বিশিষ্ট তাবেঈনদের একজন ছিলেন- তিনি বলেন, আমি মানুষের মুখে সব সময় শুনে আসছি তারা এ কথাই বলেন।

যে কুরআন আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের উপর নাযিল করেছেন, তাই হলো এ কুরআন যেটিকে মুসলিমগণ তিলাওয়াত করে এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা অবশ্যই আল্লাহর বাণী, অন্য কারো বাণী নয়, যদিও বান্দাগণ তা স্বীয় যের, যাবর, পেশ ও নিজ কণ্ঠে তিলাওয়াত করে এবং তারা তা অন্যের কাছে পৌঁছায়। কারণ, কালাম তার বলে ধরা হয় যে প্রথমে বলে। কালাম তার হয় না যে পৌঁছানোর জন্য বা উচ্চারণের উদ্দেশ্যে বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

যদি মুশরিকদের মধ্যে হতে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও। *(সূরা আত তাওবা ৯: ৬)*

এটিই কুরআন যা গ্রন্থকারে সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَّجِيدٌ، فِيْ لَوْحٍ مَّحفُوظْ﴾

বরং এটি কুরআন মাজীদ, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। *(সূরা আল বুরুজ ৮৫: ২১-২২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً، فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةْ﴾

আল্লাহর নিকট হতে এক রসূল যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র গ্রন্থ। যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে। *(সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮:২-৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ، فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾

নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত আছে। *(সূরা আল ওয়াকি'আহ ৫৬: ৭৭-৭৮)*

আল-কুরআন তার বর্ণ, ছন্দ ও অর্থে আল্লাহর বাণী। সবই কুরআন ও আল্লাহর বাণীর অন্তর্ভুক্ত। হরফের শেষের যের, যাবর, পেশ, তানভীন, সাকিন হরফেরই পূর্ণতা। যেমন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات"

যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করল তার শেষ বর্ণের ধ্বনি (যাবার, যের, পেশ, তানভীন, সাকিন ইত্যাদি) উচ্চারণ করে পড়ল, প্রতিটি হরফের জন্যে তার দশটি করে পুণ্য রয়েছে।[৬৮]

আবু বকর ও উমর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কুরআনের ই'রাব (যাবর, যের, পেশ, তানভীন, সাকিন ইত্যাদি) সংরক্ষণ করা কুরআনের কোনো কোনো হরফ (সাত হরফে নাযিল হওয়ার কোনো একটি হরফ) সংরক্ষণ করার চেয়ে আমার নিকট উত্তম।

মুসলিমগণ যদি স্বরচিহ্ন (নুকতা ও যের, যাবর ও পেশ) বিহীন কুরআন লিপিবদ্ধ করতে পছন্দ করে, তাহলে তা বৈধ। যেমন, ছাহাবীগণ নুকতা ও হারাকাত বিহীন মাসহাফ লিপিবদ্ধ করেছেন। কেননা, তারা ছিলেন আদি আরবী ভাষী। আরবী ভাষাগত কোন ভুল তাদের ছিল না। উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কুরআনের যে কপিটি তাবেঈনদের যুগে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিল তাও ছিল অনুরূপ।

---

৬৮. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৯১০, বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান হা/৫৩৩।

অতঃপর তাতে জনগণের তিলাওয়াত ভুল পরিলক্ষিত হয়। তখন প্রয়োজনের দাবীতে আল কুরআনের সংকলিত গ্রন্থাবলী স্বরচিহ্নের (নুকতা, যের, যাবর ও পেশ) দ্বারা হারাকাত দেয়া হয়। তারপর বর্ণের উপর আধুনিক স্বরচিহ্ন প্রদান করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলিমদের থেকে এ বিষয়ে মতবিরোধ বর্ণিত রয়েছে। কেউ এটিকে বিদ'আত হওয়ার কারণে অপছন্দ করেছেন। কেউ কেউ এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন এটি বিদ'আত। কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রয়োজনের জন্যে মাকরূহ হবে না। অপর দিকে কেউ কেউ ই'রাব বর্ণনার সুবিধার্থে হারাকাত দেয়া পছন্দ করেছেন কিন্তু নুকতা দেয়া অপছন্দ করেছেন। ছ্বহীহ কথা হলো এতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

-শব্দ যে আল্লাহর বাণীর অংশ এর সত্যায়ন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত হাদীছ, যাতে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা শব্দ আকারে কথা বলেছেন। আদম আলাইহিস সালামকে সশব্দে ডেকেছেন। হাদীছে এ বিষয়ে বহু উদাহরণ বিদ্যমান। এটিই হলো পূর্বসূরী আলিম সমাজ ও আহলে সুন্নাহর আক্বীদার সারাংশ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ বলেন, আল্লাহর কালাম মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়। চাই তা পঠিত হোক বা লিখিত হোক। বান্দার কুরআন তিলাওয়াতকে মাখলুক বলা যাবে না। কারণ, তাতে অবতীর্ণ কুরআন প্রবিষ্ট। আর এও বলা যাবে না যে, তা মাখলুক নয়। কারণ, তাতে বান্দার কর্ম প্রবিষ্ট। পূর্বসূরী ইমামদের কেউ এ কথা বলেননি যে, বান্দার কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ চিরস্থায়ী। বরং যারা এ কথা বলেছেন অর্থাৎ বান্দার কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ মাখলুক নয় তাদের প্রতিবাদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, মিদাদ বা কালি চিরস্থায়ী সে সবচেয়ে বড় মূর্খ ও সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ لَو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

তুমি বলঃ সমুদ্রগুলি যদি আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার রবের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে যদিও এর মতো আরো সমুদ্র আনা হয়। *(সূরা আল কাহাফ ১৮: ১০৯)* উপরের আয়াত প্রমাণ করে যে, কালি দ্বারা আল্লাহর কথাসমূহ লেখা থাকে।

-অনুরূপভাবে যারা বলে, কুরআন মাসহাফে নয়, মাসহাফে যা রয়েছে তা হলো- কালি, কাগজ, বিবরণ ও শব্দগুচ্ছ, তবে তারাও পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতী। সুতরাং কুরআন হলো আল্লাহর বাণী যা আল্লাহ মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর তা দুই গিলাফের মধ্যে রয়েছে। কালাম মাসহাফেই- যে পদ্ধতিতে মানুষ তাকে কুরআন বলে জানে- তার রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যদ্বারা অন্য সব বস্তু থেকে তা স্বতন্ত্র।

-অনুরূপভাবে যে সুন্নাতের উপর বাড়াবাড়ি করে এবং বলে বান্দার শব্দ ও তার আওয়াজ স্থায়ী, সেও গোমরাহ ও বিদআতী। যেমন, ঐ ব্যক্তি যে বলে, আল্লাহ তা'আলা শব্দ ও আওয়াজ দ্বারা কথা বলে না। সেও বিদ'আতী ও সুন্নাহকে অস্বীকারকারী। অনুরূপভাবে যে বাড়ায় এবং বলে কালি সর্বপ্রাচীন, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় গোমরাহ যে বলে মাসহাফে আল্লাহর কোনো কালাম নেই।

আর যে সব মূর্খরা এর উপর বাড়িয়ে এ কথা বলে, কাগজ, চামড়া, কালি ও দেওয়ালের টুকরা আল্লাহর কালাম। সে ঐ ব্যক্তির মতো যে বলে, আল্লাহ তা'আলার কুরআন বলেননি এবং কুরআন তার বাণীও নয়। কুরআনে কারীম আল্লাহর কালাম সাব্যস্ত করণে এ ধরনের বাড়াবাড়ি ঠিক তার বিপরীতে নিষেধ করার মতোই; যারা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার দিকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। আর উভয় দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বাইরের লোক।

অনুরূপভাবে আল্লাহর কালামের নুকতা, হারাকাত ইত্যাদিতে আলাদা আলাদা করে হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচক কিছু বলা উভয়টিই বিদ'আত। এ বিদআতটি (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়ার সমকালের) একশ বা তার চেয়ে সামান্য বেশী বছর ধরে আবিষ্কার হয়েছে। কারণ, যে বলে যে কালি দ্বারা হরফে নুকতা ও হারাকাত দেয়া হয়, তা কাদীম বা সর্বপ্রাচীন সে অবশ্যই গোমরাহ ও মূর্খ। আর যে বলে কুরআনের ই'রাব তথা শেষ শব্দের হারাকাত কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেও গোমরাহ ও বিদআতী। বরং কর্তব্য হচ্ছে এটা বলা যে, এ আরবী কুরআন সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। আর তখন যাবতীয় হরফ ও ই'রাব বা হারাকাতও সেটার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যেমনটি যাবতীয় অর্থ তার অন্তর্ভুক্ত হবে।

আরো বলা হবে যে, দু'গিলাফের মাঝখানে থাকা সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। কারণ, যদি মাসহাফটি নুকতা ও হারাকাত বিশিষ্ট হয় তখন এ কথা বলা যাবে যে, দু'গিলাফের মধ্যে পঠিতব্য কথা সবই আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর যদি নুকতা ও হারাকাত বিহীন লেখা হয়, যেমন পুরাতন মাসহাফ যেটি সাহাবাগণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তখনও এ কথা বলা যাবে যে, দু'গিলাফের মধ্যে পঠিতব্য কথা সবই আল্লাহ তা'আলার বাণী। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করে, তাদেরকে এমন কোনো ফিতনায় জড়ানো জায়েয নেই; যার কোনো বাস্তব উপকারিতা নেই, বরং তা কেবল শব্দগত মতপার্থক্য। কেননা দীনের মধ্যে দলীলবিহীন নতুন কিছু করা জায়েয নেই।

(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে)

ছাহাবীগণের বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন

ছাহাবীগণের ফযীলতের প্রমাণসমূহ

অনুরূপভাবে ছাহাবীদের [الصحابة] বিষয়ে ও রসূলের আত্মীয়দের [القرابة] ব্যাপারে মধ্যপন্থা ও মধ্যপথ অবলম্বন করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর ছাহাবীদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, আর তাদেরও প্রশংসা করেছেন যারা ছিল একনিষ্ঠতার সাথে তাদের আনুগত্যকারী-মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা আরো জানিয়েছেন যে, তিনি ছাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের কয়েক স্থানে তাদের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

মুহাম্মদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। আর তার সঙ্গে যারা আছেন তারা কাফিরদের উপর বড়ই কঠোর এবং তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল। *(সূরা আল ফাত্হ ৪৮: ২৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে। *(সূরা আল ফাতহ ৪৮: ১৮)*

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

"لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحُدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"

তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিও না। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে

তাহলেও ছাহাবীদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সাওয়াবে পৌঁছতে পারবে না।[৬৯]

চার খলিফার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা

[المفاضلة بين الخلفاء الأربعة]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্যে মুতাওয়াতির সূত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।[৭০]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর পর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফত গ্রহণের বায়'আতের উপর ছাহাবীগণ একমত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا"

নবুওয়াতী খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। অতঃপর রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।[৭১]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة "

আমার পর আমার সুন্নাত ও হিদায়াত প্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী খলিফাদের সুন্নাহ গ্রহণ করা তোমাদের প্রতি অপরিহার্য। তোমরা তা গ্রহণ করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। আর দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার থেকে দূরে থাকবে। কারণ দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি সবই পথভ্রষ্টতা।[৭২]

আর আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিদায়াত প্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী খলিফাদের সর্বশেষ ছিলেন।

---

৬৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩।
৭০. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬২৯ ও তিরমিযী হা/২২২৬।
৭১. হাসান: আবুদাউদ হা/৪৬৪৬, তিরমিযী হা/২২২৬।
৭২. ছ্বহীহ: আহমাদ ৪/১২৬, আবুদাউদ হা/৪৬০৭, ইবনে মাজাহ হা/৪২।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাধারণ মানুষ, আলিম নেতৃবর্গ ও সৈন্যবাহিনী সবাই ছাহাবীদের মর্যাদার বিষয়ে একমত যে, প্রথম স্তরে আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। এ মর্মে দলিলসমূহ ছাহাবীদের ফযীলত বিষয়ক বহু হাদীছ বিদ্যমান। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ছাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত বিবাদ বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা [الإمساك عما شجر بين الصحابة]

তদ্রূপ ছাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বনের প্রতি আমরা ঈমান পোষণ করি। আমরা আরো অবগত আছি যে, এ মর্মে বর্ণিত বহু কথা আছে যা বানোয়াট। আর কিছু ছিল ইজতিহাদী বিষয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম মুজতাহিদ ছিলেন।

আর ইজতিহাদে (শরী'আত গবেষণায়) সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তাদের জন্য রয়েছে দু'টি পুরষ্কার, আর ভুল হলে একটি পুরস্কার যা তাদের সৎকর্মে পরিণত হবে। ভুলের জন্য তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন। মহান আল্লাহর রহমতে তাদের পাপ সমূহের উপর তাদের পূণ্যসমূহ অগ্রবর্তী হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওবা, বিশেষ পুণ্যাবলী, পাপ বিমুক্ত হওয়ার বিপদ আপদ বা অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের পাপকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ, তারা এ উম্মতের স্বর্ণ যুগের অধিবাসী। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"خير القورن قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم"

সবচেয়ে উত্তম যুগ সেই যুগ যে যুগের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তার পরবর্তী যুগ।[৭৩]

এ উম্মতই হলো শ্রেষ্ঠতম উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও জানা যায় যে, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও তার সহযোগী যুদ্ধ বাহিনীর চেয়ে আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু উত্তম ও অধিক সত্যের নিকটবর্তী ছিলেন।

যেমন, ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

৭৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৩৩।

"تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق"

মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দল বের হয়ে যাবে। দু'দলের মধ্যে যেটি হকের বেশি কাছাকাছি সেটিকে তারা হত্যা করবে।[৭৪]

এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদমূলক সকল দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রকৃষ্ট দলিল। আর আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন হকের অধিক নিকটবর্তী।

পক্ষান্তরে সা'দ বিন আবী ওক্কাছ, ইবনে উমারসহ অনেকে ফিৎনার মধ্যে কোন একদলে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে বসে ছিলেন। তারা ফিৎনার যুগে সশস্ত্র যুদ্ধ হতে বিরত থাকার অকাট্য দলিল সমূহ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ আহলে হাদীছ ও আহলে ইলম এর উপরই সু-প্রতিষ্ঠিত।

আহলে বাইতদের হক্ব [حقوق آل البيت]

অনুরূপভাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার-বংশধরের প্রতিও মুসলিম জাতির অধিকার আছে। তাদেরকে দেখাশুনা করা মুসলিম কর্ণধারদের উপর ফরয। কেননা বিনা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে ধার্য্য করে দিয়েছেন।

এমনকি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর দরুদ পাঠের সময় তার বংশধরকে অন্তর্ভুক্ত করে দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জন্য বলেন, তোমরা বল:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَّعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ"

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর। যেমন তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর। যেমন

---

৭৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৬৫, আহমাদ ৩/২৫, আবুদাউদ হা/৪৬৬৭।

তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[৭৫]

মুহাম্মাদ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধরের উপর যাকাত-সদকা খাওয়া হারাম ছিল। ইমাম শাফেঈ রহি., আহমদ ইবনে হাম্বল রহি. সহ অনেকেই এ কথা বলেছেন। নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"

যাকাত মুহাম্মদ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাম্মদ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের জন্যে হালাল নয়।[৭৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

হে নাবী পরিবার, আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। *(সূরা আল আহযাব ৩৩: ৩৩)*

আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত হারাম করেছেন। কেননা, তা মানুষের ময়লা। কোন কোন সালাফ বা পূর্বসূরী আলিম বলেছেন, আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে ভালোবাসা ঈমান এবং তাদের সঙ্গে ঈর্ষা করা মুনাফিকী। আর বনী হাশিমকে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা নিফাকী-পাপ।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, যখন কতিপয় সম্প্রদায় বনী হাশিমের উপর অত্যাচার করেছিল তখন আব্বাস সে বিষয়ে রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে অভিযোগ করলে, তিনি আব্বাসের উদ্দেশ্যে বলেন:

"والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي"

হে জন সমাজ! যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, আমার কারণে তোমরা বনী হাশিমকে মহব্বত না করলে জান্নাতে যেতে পারবে না।[৭৭]

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من

---

৭৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৭০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪০৬।
৭৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৭২।
৭৭. যঈফ: আহমাদ ১/২০৭, তিরমিযী হা/৩৮৫৮, ইবনে মাজাহ হা/১৪০।

كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم"

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসমাঈলকে মনোনিত করেছেন, বনী ইসমাঈল থেকে বনী কিনানাকে মনোনিত করেছেন। বনী কিনানা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ গোত্র থেকে বনী হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন।[৭৮]

ফিতনা ও তার প্রভাব [الفتنة وآثارها]

উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যার মাধ্যমে ফিতনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এক ও অখণ্ডিত মুসলিম মিল্লাত বিবিধ দলে উপদলে বিভক্ত হল। এক দল উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ নিল এবং তার প্রতি অতি শ্রদ্ধায় সীমালঙ্ঘন করল এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছ থেকে বিমুখ হল, এরা ছিলো অধিকাংশ শামবাসী। তারা নির্দ্বিধায় আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে গালি গালাজ ও তার সঙ্গে চরম ঈর্ষা শুরু করল।

অপর দিকে অধিকাংশ ইরাকবাসী আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ গ্রহণ করল এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে শ্রদ্ধা করতে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করল, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে সর্ম্পক ছিন্ন করল, তার সঙ্গে বিরোধের পাহাড় ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে উঠল, তাকে গালিগালাজ দেয়া শুরু করল। এভাবে এ ফিরকাবন্দী ও বিদ'আত প্রকট আকার ধারণ করল। এরা শেষ পর্যন্ত আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে গালি দেওয়া শুরু করল। ফলে সেদিন এটি বৃহত্তর বিপদ রূপে প্রকাশ পেল।

সুন্নাহ বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শ হলো উসমান ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়কে মহব্বত করা। আর আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে তাদের দু'জনের উপরে অগ্রাধিকার দেয়া। তারা দু'জন এ জন্যে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য যে, তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ গুণে বিশেষিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে দলাদলি ও বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষেধ করেছেন। এটি এমন স্থান যেখানে ঐক্যের উপর অটুট থাকা ও আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা মু'মিনের উপর ওয়াজিব করেছেন। কারণ, ইলম, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণের উপরই সুন্নাতের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

৭৮ . ছহীহ মুসলিম : ২২৭৬।

যারা ছাহাবীদের গালি দেয় তাদের শাস্তি

[عقوبة من سبّ الصحابة]

অতঃপর যখন রাফিযী সম্প্রদায় ছাহাবীদের গালি গালাজ শুরু করল, তখন আলিমগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যারাই ছাহাবীদেরকে গালি দিবে তাদেরকেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। তারপরও রাফিযী সম্প্রদায় ছাহাবীদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করা ছাড়া আরো বহু বাড়াবাড়ি করেছে। আমি ইতোপূর্বে বহু স্থানে তার উল্লেখ করেছি এবং ঐ কাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শারয়ী বিধানও বর্ণনা করেছি। সে সময় ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার বিষয়ে কেউই কোনো কথা উপস্থাপন করেনি। তার বিষয়টি দীনী কোনো আলোচনার বিষয়ও ছিল না। পরবর্তীতে তার বিষয়ে বহু কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো দল তাকে অভিসম্পাত প্রদান করেছে। হয়তো এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের অভিশাপের দরজা খুলে দেয়া।

কিন্তু অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কাউকে নির্দিষ্টভাবে অভিসম্পাত করা কখনো পছন্দ করেননি। সুন্নাতের প্রতি আজ্ঞাবহ কতক মুসলিম (আহলে সুন্নাত কর্তৃক) অভিসম্পাত না করার বিষয়টি জানতে পেরে মনে করল ইয়াজিদ ছিল অনেক বড় নেককার ও হিদায়াতের বিশেষ ইমাম। (অথচ এটা তাদের ভুল ধারণা)। বস্তুত ইয়াজিদের বিষয়ে দুই দিক থেকে বিপরীত মুখী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে অর্থাৎ একদল তার সম্পর্কে বলে, সে কাফির, দীন-চ্যুত মুরতাদ। কারণ, সে রসূল এর নাতীকে হত্যা করেছে, তার নানা উত্বাহ ইবনে রাবী'আহ ও তার মামা ওয়ালিদসহ যাদেরকে কাফির মনে করে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি আনসার ও তার বংশধরকে হাররা নামক স্থানে হত্যা করেছে, প্রকাশ্য মদ খাওয়া, দিবালোকে গর্হিত কার্যাবলী সম্পাদনসহ নানা অশ্লীল কাজে জড়িত ছিলেন বলে তারা উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে প্রশংসাকারীগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুপথ প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক ন্যায়পরায়ণ নেতা ছিলেন। তিনি ছাহাবী বা শীর্ষ স্থানীয় ছাহাবীদের অন্যতম একজন। তিনি আল্লাহর ওলীদের বিশেষ একজন। কখনো কখনো কেউ এও বিশ্বাস করতো যে তিনি নাবীদের একজন ছিলেন। তারা আরো বলেছেন যারা ইয়াযীদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখবেন।

তারা শাইখ হাসান ইবনে আদী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়াজিদ এরূপ এরূপ মহাগুণের অধিকারী মহান ওলী ছিলেন। যারা ইয়াজিদের সমালোচনা থেকে বিরত হবে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। শাইখ হাসানের সমকালীন ঐসব ভক্তরা মহামান্য শাইখ আদীর মতের বিরুদ্ধে তার ও ইয়াজিদের বিষয়ে তারা বহু ভ্রান্ত কবিতা, বাড়াবাড়িমূলক বহু রচনাবলী তার নামে

ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা শাইখ আদি ও ইয়াজিদ বিষয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে যা শাইখ আদি যে মতের উপর ছিলেন তা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। তার বিরুদ্ধে যে সব অপবাদ দেয়া হয়, তা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার মধ্যে এ ধরনের কোন দি'আত ছিল না, যার অপবাদ তারা রটিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি রাফেযীদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাদের রোষানলে পড়েন। তারা শাইখ হাসানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মুসলিম জাহানে ফিতনার কালো ছায়া নেমে আসে যা আল্লাহ ও তার রসূল কখনো পছন্দ করেননি। এ হলো ইয়াজিদের বিষয়ে দু'দিক থেকে বিপরীতমুখী বাড়াবাড়ির সংক্ষিপ্ত ভাষা চিত্র। ইয়াজিদ সম্পর্কে উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধী এ ধরনের বাড়াবাড়ি মুসলিম সমাজ ও আলিমদের ঐকমত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী কার্যকলাপ।

কেননা, ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়াহ উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতে জন্ম গ্রহণ করে। তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত পাননি। আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী তিনি ছাহাবী ছিলেন না। দীন ও যথাযোগ্য কাজের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলিম যুবকদের একজন। তিনি কাফির বা দীনচ্যুত মুরতাদ ছিলেন না। তার পিতার মৃত্যুর পর কিছু সংখ্যক মুসলিমদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং কিছু সংখ্যক মুসলিমদের সম্মতিতে তিনি মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। তার ছিল বহু বীরত্ব ও সুমহান বদান্য, তিনি প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে জড়িত ছিলেন না। যেমন কিছু সংখ্যক বিরুদ্ধবাদীরা বর্ণনা করে থাকে।

ইয়াজিদের শাসন আমলের কতক বড় বড় ঘটনা

এক: হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যা কার্য তার অন্যতম। তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যার নির্দেশ দেননি এবং তার হত্যার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেননি। তার সম্মানহানী করে দন্তের উপর লাঠির আঘাত করে ঠাট্টা বিদ্রূপও করেননি। হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মস্তক শাম এ নিয়ে যেতেও নির্দেশ দেননি। তাকে হত্যার কারণে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেননি। বরং তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বাধা প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তার কর্মকে প্রতিহত করতে নির্দেশ দেন তাতে যদি যুদ্ধ করা লাগে তবুও। ইয়াযীদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী ও প্রতিনিধি তার নির্দেশের উপর বাড়াবাড়ি করেছে।

সামর ইবনে জুল জাওশান সৈন্যদলকে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে তাকে হত্যার জন্য উৎসাহিত করেছে। ফলে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তার প্রতি সীমালঙ্ঘন করেছিল। তখন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ইয়াযীদ এর নিকট নিয়ে যাওয়া অথবা প্রহরারত অবস্থায় সুরক্ষিত সীমান্ত শহরে পাঠানো বা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যে

তাদের নিকট আবেদন করেছিলেন। তারা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। সে উমার ইবনে সা'দকে নির্দেশ দেন সে যেন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে তারা তাকে ও তার পরিবারের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তার হত্যাকান্ড ছিল ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। কেননা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার পূর্বে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করা এ উম্মতের ভয়াবহ ফিতনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাদের দু'জনকে তারাই হত্যা করেছে যারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব।

তারপর হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবারবর্গ যখন তার দরবারে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদেরকে সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে ছিলেন। ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার জন্য উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে অভিশম্পাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি ইরাকের অনুসারীদের বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম শুধুমাত্র হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যা ছাড়া। তা সত্ত্বেও তিনি তার হত্যার কোন প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন কর্ম তার থেকে প্রকাশ পায়নি। তার হত্যার প্রতিশোধ বা বদলা নেননি অথচ এটা তার উপর ওয়াজিব ছিল। তাই হকপন্থীরা তার অন্যান্য কার্যকলাপের সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব পরিত্যাগ করার সমালোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে যারা তার সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করে, তারা তার উপর বহু মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়।

দুই: মদীনাবাসীগণ তার সঙ্গে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের পর তা ভঙ্গ করেছিল, তার প্রেরিত প্রতিনিধিকে পরিবারসহ সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি একটি সৈন্যদলকে এ মর্মে প্রেরণ করেন যে, মদীনাবাসীর নিকট তারা আনুগত্য কামনা করবে, এতে যদি তারা সম্মত না হয় তাহলে তারা তিন দিন পর্যন্ত তাদের বুঝার সুযোগ দিবে। তারপর বাধা দিলে তারা অস্ত্রের সাহায্যে মদীনায় প্রবেশ করবে। তিন দিন পর তাদের রক্তকে তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করবে। নির্দেশ মোতাবেক সৈন্যদল তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় অপেক্ষায় ছিল। তারপর তারা গণহত্যা শুরু করে, লুটতরাজ আরম্ভ করে, হারামকৃত মহিলাদেরকে জোড় পূর্বক যৌনক্রিয়ার পাত্রে পরিণত করে। তারপর সে অপর একটি সৈন্য বাহিনীকে মক্কায় প্রেরণ করে, তারা মক্কা অবরোধ করে। ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্ত তারা মক্কা অবরোধ করে রেখেছিল। এ ছিল ইয়াজিদের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের সংক্ষিপ্ত চিত্র, যা তার নির্দেশে সংঘটত হয়েছিল। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো তারা তাকে গালিও দিবে না আর ভালোও বাসবে না।

ছালিহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম, জনগণ বলে, তারা ইয়াযীদকে ভালোবাসে। তিনি বললেন, হে আমার বৎস্য, যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে কি ইয়াযীদকে ভালোবাসতে পারে! আমি বললাম, হে আমার বাবা! তাহলে আপনি তাকে অভিসম্পাত করেন না কেন? তিনি বললেন, হে আমার বৎস্য! তুমি কি কখনও তোমার বাবাকে কারো প্রতি অভিশাপ দিতে দেখেছ?

তার কর্তৃক বর্ণিত আছে- তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া কর্তৃক হাদীছ বর্ণনা করুন। তিনি জবাবে বললেন, না। ইসলামে তার কোন সম্মানিত স্থান নেই। সে কি ঐ ব্যক্তি নয় যে মদীনাবাসীর উপর এই এই অপকর্ম ও অত্যাচার করেছিল?

মুসলিম নেতৃবর্গ আলিমদের নিকট ইয়াযীদ হলো রাজতান্ত্রিক বাদশাদের অন্যতম। আল্লাহর ওলী ও সৎ মানুষদের মতো তারা তাকে ভালোবাসেন না। তাকে তারা গালিও দেন না। কেননা, কোন নির্দিষ্ট মুসলিমকে অভিশাপ দেয়া তারা পছন্দ করেন না।

কেননা, ইমাম বুখারী ছ্বহীহ বুখারীতে উমার ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু কর্তৃক ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি যাকে হিমার (গাধা) বলা হতো। সে খুব বেশী মদ পান করত। আর যখন মদ খেত তখন আল্লাহর রসূলের নিকট আনা হতো এবং মদ পানের শাস্তি স্বরূপ তাকে প্রহার করা হতো। একবার এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমার প্রতি অভিশাপ করুন! কারণ, তুমি বারবার আল্লাহর নাবীর নিকট এ অপরাধ নিয়ে আস।

তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বললেন:

"لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"

তাকে অভিশাপ করো না। কারণ, সে আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ভালোবাসে।[৭৯]

তা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাহর একদল লোক তাকে অভিশাপ করা বৈধ মনে করেন। কেননা, তারা বিশ্বাস করেন তিনি এমন নির্মম অত্যাচার করেছিলেন, যে অত্যাচার করার কারণে সে অত্যাচারীকে অভিশাপ করা যেতে পারে।

অপর দল তাকে মহব্বত করা পছন্দ করেন। কারণ, সে একজন মুসলিম। ছাহাবীদের যুগে সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ছাহাবীগণ তার আনুগত্যের

৭৯ . ছ্বহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ : ৬৭৮০।

বায়'আত নিয়েছিলেন। তারা বলেন, তার বহু কল্যাণময়ী কাজও ছিল। অথবা তিনি যা করেছিলেন তাতে তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন। সঠিক কথা হলো, যার প্রতি মুসলিম ইমামগণের মতামত প্রতিষ্ঠিত, তা হলো তাকে বিশেষভাবে ভালোবাসারও দরকার নেই এবং তাকে অভিসম্পাত করাও যাবে না। তারপরও যদি সে যালিম ও ফাসিক হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'আলা যালিম ও ফাসিককে ক্ষমা করে দেন। বিশেষ করে যখন সে কোন মহান কাজ করে থাকে।

ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইমাম বুখারী ছ্বহীহ বুখারীতে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রথম যে দল কুসতুন্‌তনিয়্যায় (কনস্টান্টিনোপল) যুদ্ধ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে।[৮০]

আর ঐ স্থানে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে। আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও তার সঙ্গী ছিলেন। অবশ্য ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ও তার চাচা ইয়াজিদ ইবনে আবী সুফিয়ান দু'জনের নাম এক হওয়ার কারণে সংশয় দেখা দেয়। ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান হলেন ছাহাবী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ছাহাবীদের অন্যতম। তিনি হারব কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি। শাম এর আমীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম যাকে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাম বিজয়ের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বিদায়কালীন তার উষ্ট্রবাহন ধরে হেঁটে হেঁটে অছিয়ত করছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূলের প্রতিনিধি! তুমি আরোহণ করবে নাকি আমি অবতরণ করবো? তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, আমি আরোহী হবো না আর তুমি অবতরণকারী হবে না। আমি আশা করি আল্লাহর রাস্তায় আমার জীবনের পাপ রাশি শেষ হয়ে যাক।

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত আমলে শাম বিজয়ের পর যখন তিনি মারা যান, তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার ভাই মু'য়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তারপর উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত আমলে ইয়াজিদের জন্ম হয়। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শামে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং তারপর যা ঘটার তা ঘটে গেল।

ওয়াজিব হলো এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার সমালোচনার দ্বারা মুসলিমদেরকে পরীক্ষায় ফেলা থেকে বিরত থাকা। কারণ এরূপ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব পরিপন্থী। এ সব বিভ্রান্তির ফলে কতিপয় জাহিল মনে করে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া শীর্ষ স্থানীয় ছাহাবীদের অন্যতম এবং ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ইমাম অথচ এটি সুস্পষ্ট ভুল।

---

৮০ . ছ্বহীহ বুখারী, জিহাদপর্ব : ২৯২৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য

[الفرقة والاختلاف]

(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম আরো একটি আক্বীদা হলো)

কোনো একটি দলের প্রতি সম্বোধন করে উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা জায়েয নেই [لا يجوز تفريق الأمة بالانتساب إلى طريقة]

মুসলিম সমাজে দলাদলি সৃষ্টি করা এবং মানুষকে সেই বিষয়ে পরীক্ষায় ফেলানো, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নির্দেশ দেননি তা জায়েয নেই। যথা: কোন ব্যক্তিকে বলা তুমি আমার পন্থী, আমার কর্মী বা আমার দলের, আর অমুক অন্য দলের। কেননা, এই সব পরিভাষা বাতিল।

এ মর্মে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহর কিতাব, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ ও পূর্ববর্তী আলিমদের কোন গ্রহণযোগ্য আছারেও (ছাহাবীদের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আছার বলে) বিদ্যমান নেই। সুতরাং আমার দলের, আমার কর্মী ইত্যাদি পরিভাষা বর্জনীয়। বরং মুসলিমের উপর ফরয হলো যখন তাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কে? তখন আপনি বলবেন আমি কোন দলের কর্মী ও কোন দলপন্থী নই। আমি কেবল মাত্র আল কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলিম।

এ ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এর বর্ণিত হাদীছটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তিনি একদা বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বললেন, আপনি উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দলে নাকি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দলে? তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন আমি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দলেও নই এবং উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দলেও নই; বরং আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দলের অনুসারী।

এভাবে প্রত্যেক পূর্ববর্তী আলিম বা সালাফগণ বলেছেন- এ সব দলাদলির শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। তাদের মধ্যে জনৈক আলিম বলেন, দু'টি মহা নিয়ামত অবলম্বনের ব্যাপারে আমি কোন পরওয়া করি না।

এক- আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দিকে আমাকে পরিচালিত করেছেন।

দুই- এ সব দলাদলি থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে আমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মুমিন ও ইবাদুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার বান্দা।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের যে নাম দিয়েছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। নব আবিষ্কৃত মানুষের তৈরী দলীয় নাম যা তারা ও তাদের পূর্ব পুরুষগণ রেখেছেন, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বরং এসব নামসমূহ দ্বারা নামকরণ করার অবকাশ যেসব ক্ষেত্রে রয়েছে, যেমন, মানুষকে ইমামের দিকে সম্বোধন করা। যথা- হানাফী, মালিকী, শাফেঈ, হাম্বলী ; অথবা কোনো শাইখের দিকে সম্বোধন করে বিভিন্ন তরীকার নাম রাখা। যথা- কাদিরী (নকশবন্দি) ও আদওয়ী শাইখের তরিকাপন্থী অথবা কোনো গোত্রের দিকে সম্বোধন করে বিভিন্ন গোত্রের নামকরণ করা। যথা- কাইসী গোত্র ও ইয়ামানী গোত্র। অনুরূপ বিভিন্ন জাতীয়তার নামকরণ করা। যথা- শামী, ইরাকী, মিশরী ইত্যাদি। এগুলোর দিকে সম্পর্কযুক্ত করে নাম দেয়া জায়েয হলেও কোন মুসলিমের জন্যে বৈধ নয় যে, সে উপরোক্ত দলের ভিত্তিতে কোন মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবে, আর এসব নামের ভিত্তিতে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে বা মৈত্রী স্থাপন করবে এবং তারই ভিত্তিতে শত্রুতা পোষণ করবে। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন, তাদের মধ্যে তাক্বওয়া (আল্লাহর আদেশ পালনকারী ও নিষেধ বর্জনকারী) অবলম্বনকারী ব্যক্তিবর্গ। তারা যে কোন দলের হোক না কেন।

ওলী হওয়া ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়

[الولاية ومستلزماهٔا]

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীরাই হলো আল্লাহ তা'আলার ওলী। আর তারা হলেন ঈমানদার ও মুত্তাকী (আল্লাহর আদেশ পালনকারী ও নিষেধ বর্জনকারী) ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে সংবাদ দেন যে, তার ওলী হলো তাক্বওয়া অবলম্বনকারী মুমিনগণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ (يونس:٦٢-٦٣)

জেনে রেখো! আল্লাহর বন্ধুদের জন্যে কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে। *(সূরা ইউনুস ১০: ৬২-৬৩)*

তারপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে মুত্তাকী কারা তার সংজ্ঞা প্রদান করেন:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও এতে কোন কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালোবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদের এবং মানুষদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য দান করবে এবং ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্যের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য্য ধারণ করবে, মূলতঃ এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুত্তাকী। *(সূরা আল বাকারা ২: ১৭৭)*

তাক্বওয়ার সংজ্ঞা

তাক্বওয়া হলো আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন তা সম্পাদন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ওলীদের অবস্থা ও ওলী হওয়ার মাধ্যমগুলো বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصربه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه" (البخاري)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি তার দ্বারা কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকলে অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা অবশ্যই প্রদান করি। আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোন দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ করি একজন মু'মিনের মৃত্যু সর্ম্পকে, কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।[৮১]

---

৮১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫০২।

উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের স্তর হলো দু'টি।

এক- ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করা।

দ্বিতীয়ত- ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের পর নফল আদায়ের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা।

প্রথমটি হলো ডানপন্থী পূণ্যবান সত্যপন্থীদের স্তর। দ্বিতীয়টি হলো অগ্রগামী নৈকট্য অর্জনকারীদের স্তর। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

পূণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নি'আমাতের মাঝে। উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদেরকে পান করানো হবে ছিপি-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়। তার ছিপি হবে মিশ্‌কের, প্রতিযোগীরা যেন এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক।[৮২]

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ডানপন্থীদের সঙ্গে রসিকতা করা হবে। নৈকট্যলাভকারীরা সেখানে (নেশা মুক্ত) খাঁটি শরাব পান করবে। এরূপ অর্থবোধক কথা আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে; তারাই আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত।[৮৩]

৮২. সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩: ২২-২৬
৮৩. সূরা ইউনুস ১০:৬২-৬৪, সূরা আল আনফাল ৮:৩৪

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার স্বরূপ [حقيقة الولاء والبراء]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের বিরোধিতা করা মু'মিনের উপর ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [٥:٥١] فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ [٥:٥٢] وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ [٥:٥٣] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٥:٥٤] إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ [٥:٥٥] وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [٥:٥٦]

হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মাঝে (বন্ধুত্বের জন্য) গিয়ে বলে, 'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে'। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তার পক্ষ হতে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে। আর মুমিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছে যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে আছে'? তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়েছে ,ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তা

দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ, যারা ছ্বলাত কায়িম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ, যারা ছ্বলাত কায়িম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। আর যে আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫১ ৫৬)*

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মু'মিনের বন্ধু হলো আল্লাহ তা'আলা, তার রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রতি ঈমানদার বান্দাগণ। এ বিশেষণটি প্রতিটি মুমিন যে এ গুণে গুনান্বিত সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, চাই সে তার বংশের, দেশের, মাযহাবের অথবা স্বীয় দলভুক্ত হোক বা না হোক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। *(সূরা আত তাওবাহ ৯: ৭১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِيْ الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ﴾

যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি তারা হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নেই, তবে তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু তোমাদের ও যে জাতির মধ্যে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। আর যারা কুফরী করে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা তা (মুমিনদের পরস্পরের বন্ধুত্ব

সুদৃঢ় করা ও কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা) না কর তবে দুনিয়াতে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্যে) হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেছে- তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে আর তোমাদের সাথে একত্র হয়ে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা আল আনফাল ৮: ৭২-৭৫)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْئَ إِلَى اَمْرِ اللهِ فَاِنْ جَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

মুমিনদের দু'দল লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি দলটি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করবে আর সুবিচার করবে; আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। *(সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)*

ছ্বহীহ হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে-

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر"

পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মু'মিনের উদাহরণ হলো এক ও অখণ্ডিত দেহ। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্যে বিনিদ্রা ও ব্যথায় আক্রান্ত হয়।[৮৪]

ছ্বহীহ হাদীছে অনুরূপ আরো আছে যে,

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"

---

৮৪. ছ্বহীহ বুখারী : ৬০১১, ছ্বহীহ মুসলিম : ২৫৮৬।

একজন মুমিন আর একজন মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়। যার একাংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করে।[৮৫] অতঃপর তিনি একহাতের অঙ্গুলীগুলি অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করালেন। অনুরূপ ছ্বহীহ হাদীছ হলো:

"والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপরের জন্য তাই ভালো না বাসে[৮৬]। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه"

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে (বিপদের সময়) অন্যের নিকট সোপর্দ করতে পারে না ও তার প্রতি অত্যাচারও করতে পারে না।[৮৭]

আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও হাদীছে এরূপ বহু দলিল বিদ্যমান, যাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরই ভিত্তিতে এক মুমিন অপর মু'মিনের বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। একে অপরকে সাহায্যকারী, অনুগ্রহকারী ও দয়াশীল হিসাবে পরিণত করেছেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐক্য স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলাদলি ও মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾

তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ﴾

নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যাস্ত। *(সূরা আল আনআম ৬:১৫৯)*

---

৮৫ . ছ্বহীহ বুখারী : ৪৮১, ছ্বহীহ মুসলিম : ২৫৮৫।

৮৬ . ছ্বহীহ বুখারী : ১৩, ছ্বহীহ মুসলিম : ৪৫।

৮৭ . ছ্বহীহ বুখারী : ২৪৪২, ছ্বহীহ মুসলিম : ২৫৮০।

বড়ই পরিতাপের বিষয়! কিভাবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাতের লোকেরা বিভিন্ন দল ও বিবিধ মতভেদে বিভক্ত হয়েছে। দলের স্বার্থেই কেবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান ও প্রবৃত্তির চরিতার্থে কোনো লোক এক দলকে ভালোবাসে ও অপর দলকে শত্রু মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ তাদের নিকট নেই।

পক্ষান্তরে বর্তমান দলাদলি থেকে আল্লাহ তার নাবী মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন। বস্তুত এসব তো খারেজীদের ন্যায় বিদ'আতী দলের কর্ম যা মুসলিমদের এক ও অখন্ডিত জামা'আতকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের ভিন্নমত পোষণকারীদের রক্তপাত করাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলার রজ্জু (কুরআন ও সুন্নাহ)-কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। আর এসব দলাদলি থেকে তারা মুক্ত থেকেছে। যারা এসব দলাদলি করে থাকে, তাদের সেখানে সর্বনিম্ন ক্ষতি তো এটা ধরে নেয়া যায় যে, কোন লোক সেখানে কেবল নিছক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কাউকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে, যদিও সে অপর লোকটি তার থেকে আরো বেশী তাক্বওয়ার অধিকারী।

বস্তুতঃ ওয়াজিব হলো- যে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলকে অগ্রাধিকার দেয়, তাকে অগ্রাধিকার দেয়া। যে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের অনুসরণের বিষয়ে পশ্চাতে রয়েছে তাকে পিছিয়ে রাখা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলকে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসা, আর যে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের সাথে শত্রুতা করে তার সঙ্গে শত্রুতা করা;

আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে সে নির্দেশই দেয়া, আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব বিষয়ে নিষেধ করেছেন সে সব বিষয়েই নিষেধ করা। আল্লাহ ও তার রসূল যাতে খুশি থাকেন তাতেই খুশি থাকা।

মুসলিমগণ হবেন একটি মহাশক্তি। কিভাবে তা সম্ভব যে, একজন মুসলিম ভাইয়ের বিরোধিতা করতে করতে তাকে কাফির বা গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করে। অনেক সময় এমনও হতে পারে সত্য তার সাথেই রয়েছে এবং সে-ই কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী। যদি কোন মুসলিম ভাই কোন বিষয়ে ভুল করে সে অপরাধে তার সব কাজই ভুল বলা ঠিক হবে না। আর সব ধরণের ভুলের কারণে মুসলিম কাফির, ফাসিক ও পাপী হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের ত্রুটি ও ভুলে যাওয়া জনিত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে মুমিন ও রসূলগণের দু'আ প্রসঙ্গে বলেছেন:

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

হে আমাদের 'রব'! আমাদেরকে পাকড়াও করো না, যদি আমরা ভুল করি কিংবা ভুলে যাই। *(সূরা আল বাকারা ২:২৮৬)* ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দু'আর উত্তরে বলেছেন: 'আমি তাই করলাম'।

বিশেষ করে কখনো এমন দেখা যায়, যে তোমার সাথে একমত পোষণ করেছে, সে ইসলামের বিশেষ একটি অবস্থানে রয়েছে। যেমন, তোমাদের একজন শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাবের অনুসারী অথবা শেখ 'আদীর অনুসারী। তারপর সে কোনো একটি বিধানে তাদের বিরোধিতা করছে এবং হতে পারে সত্য ও সঠিক বিষয়টি তার সাথেই রয়েছে, তখন কিভাবে শুধু এ কারণে তার জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানকে হালাল মনে করা হবে বা লুণ্ঠন করা হবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা একজন মু'মিনের জান-মালের হিফাযত করাকে মুসলিম ও মু'মিনের দায়িত্ব-কর্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন নতুন নতুন আবিষ্কৃত নাম যার কোনো ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহের কোথাও নেই সেগুলোকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি কিভাবে বৈধ হতে পারে?

জামা'আত রহমত আর বিভক্তি আযাব

[الجماعة رحمة والفرقة عذاب]

এ ধরনের দলাদলি ও বিভক্তি, যা মুসলিম উম্মাহ ও তাদের আলিম, পণ্ডিত, আমীর ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শত্রুদের তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অপর দিকে তারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾

আর যারা বলে "আমরা খ্রিষ্টান" আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম। অনন্তর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক

বড় অংশ হারাতে বসেছে, সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম। *(সূরা আল মায়িদা ৫: ১৪)*

যখনই মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধান পরিত্যাগ করেছে, তখনই তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা এবং কাটাকাটি দেখা দিয়েছে। আর যখন জাতি বিভিন্ন দল, সংগঠন ও পার্টিতে বিভক্ত হয়েছে তখনই তারা বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলায় পতিত হয়েছে।

আর যখনই তারা একটি দলে সমবেত হয়েছে তখনই তারা সৎপরায়ণ হয়েছে ও ওয়াহীর বিধানে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। কেননা এক দলে থাকে রহমত। বিভক্ত হওয়া, দলাদলি করা ও মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়া

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

আর একতাবদ্ধতা ও ঐক্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়া মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاته وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُوْنَ، وَاعْتَصمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَته إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاته لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ، وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَـئكَ هُمُ الْمُفْلحُوْنَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহকে ভয় কর এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মারা যেও না। আর তোমরা এক যোগে আল্লাহর রুজ্জু দৃঢ় ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তারপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন; এভাবে আল্লাহ তোমাদের স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে

আহ্বান করবে ও ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে তারাই সুফল প্রাপ্ত। *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০২-১০৪)*

সৎ কাজের আদেশ দ্বারা ঐক্য ও একতাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর মতবিরোধ ও দলাদলি হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অসৎ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দ্বারা যারা আল্লাহর দেয়া শরী'আতের পাবন্দি থেকে বের হয়ে গেছে তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মানুষ সম্পর্কে এ বিশ্বাস করে যে, সে ইলাহ অথবা কোন মৃত ব্যক্তিকে বিপদ-আপদে ডাকে অথবা তার কাছে রিযিক চায়, সাহায্য চায় এবং হিদায়াত চায় অথবা তার উপর ভরসা করে, তাকে সাজদাহ করে, তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে, যদি তাওবা করে ভালো, না হয় তাকে হত্যা করা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ওস্তাদ বা পীর-মাশাইখকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর প্রাধান্য দেয় অথবা এ বিশ্বাস করে যে, কোনো পীর মাশাইখের অনুকরণ করার ফলে রসূলের অনুকরণ করার প্রয়োজন পড়ে না। তাকেও তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে ভালো, না হয় তাকে হত্যা করা হবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ওলীগণের কেউ কেউ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে (নবুওয়তের বা বেলায়েতের) অংশীদার। যেমনটি ছিল মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে খিযির। তবে তার থেকেও তাওবা তলব করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। কারণ খিযির মূসা আলাইহিস সালাম এর উম্মাতের কেউ ছিল না। তার উপর মূসা আলাইহিস সালাম এর অনুকরণ করা ওয়াজিবও ছিল না, বরং সে তাকে বলেছিল, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ইলমের এমন এক ইলমের উপর আছি যা আমার আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন, তুমি তা জানো না। আর তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ইলমের এমন এক ইলমের উপর আছ যা তোমাকে তোমার আল্লাহ শিখিয়েছেন, আমি তা জানি না। আর মূসা আলাইহিস সালাম প্রেরিত ছিল শুধু বনী ইসরাঈলের নিকট। যেমন, মূসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"

নাবীগণ তাদের জাতির নিকট বিশেষ নাবী হিসাবে প্রেরিত হয়, আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।[৮৮]

পক্ষান্তরে, মুহাম্মদ আলাইহিস সালাম মানুষ ও জ্বীন উভয় জাতীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে যে, কারো জন্য তার আনীত

৮৮ . ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৮।

শরী‘আত থেকে বের হওয়া ও তার অনুকরণ থেকে বের হওয়ার অবকাশ রয়েছে, সে অবশ্যই কাফির, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের সুন্নাতে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন কোন বিদ‘আত আবিষ্কার করে সেটার ভিত্তিতে কোন মুসলিমকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে বা তাদের জান-মালকে হালাল মনে করে, তাকে তা হতে বিরত রাখা ওয়াজিব এবং তাকে শাস্তি দিয়ে তা থেকে বাধা দিতে হবে, যদিও তাকে হত্যা করা বা তার সাথে যুদ্ধ করা লাগে। কারণ যখন সব সীমালঙ্ঘনকারী গোষ্ঠীকে শাস্তির আওতায় আনা হবে এবং সব মুত্তাকী গোষ্ঠীকে সম্মান করা হবে, তখন তা হবে সবচেয়ে মহান কাজ; যাতে আল্লাহ ও তার রসূল আলাইহিস সালাম এর নির্দেশ পালিত হয় এবং মুসলিমদের যাবতীয় কর্ম সঠিক হয়।

সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা দায়িত্বশীলদের কাজ [لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أولي الأمر]

দায়িত্বশীল অর্থাৎ যারা প্রত্যেক গোত্রের আলিম, নেতৃত্ব দানকারী শাসক ও মাশাইখ, তাদের উপর ওয়াজীব হলো, তারা সর্বসাধারণকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। ফলে তারা আল্লাহ তা‘আলা ও তার রসূল যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছে তা পালন করার জন্য জনসমাজকে নির্দেশ দিবে, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হতে দূরে থাকার জন্য তাদের নির্দেশ দিবে।

সৎ কাজের প্রকারভেদ (أنواع المعروف)

প্রথম: শরী‘আতের বিধান:

আর তা হলো, সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা, জুমু‘আর ছ্বলাত কায়েম করা, জামা‘আতে ছ্বলাত আদায় করা ওয়াজীব। আর সুন্নাত ছ্বলাতসমূহ আদায় করা। যথা- দুই ঈদ, সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণের ছ্বলাত, ইসতিস্কা, তারাবীহ, জানাযা ও অন্যান্য ছ্বলাত আদায় করা। অনুরূপভাবে শরী‘আত সম্মত সদক্বা (দান) করা, শরী‘আত নির্ধারিত সাওম পালন করা, বায়তুল হারামে হাজ্জ সম্পাদন করা।

অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবের প্রতি, তার রসূলদের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি ঈমান আনা। আর

ইহসান বিষয়ে ঈমান আনা। আর তা হলো, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন সে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছে। যদি সে তাকে দেখতে না পায়, তাহলে তিনি অবশ্যই তাকে দেখছেন এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

অনুরূপভাবে প্রকাশ্য ও গোপনে পালনীয় আল্লাহ ও তার রসূলের সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। যথা- আল্লাহ তা'আলার জন্যে দীনকে নির্ভেজাল করা, আল্লাহরই উপরে ভরসা করা, সকলের চেয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলকে বেশী ভালোবাসা, আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হওয়া, তার আযাবকে ভয় করা। আল্লাহ তা'আলার বিধানের জন্যে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা। অনুরূপভাবে সত্য কথা বলা, কৃত ওয়াদা পালন করা, যথাস্থানে আমানত সমূহ আদায় করা, বাবা-মার সঙ্গে সদ্ব্যাবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা, প্রতিবেশী, ইয়াতিম, মিসকীন, মুসাফির, স্বামী-স্ত্রী ও দাস-দাসীর প্রতি ইহসান-সৎ আচরণ করা, কথা ও কাজে ইনসাফ করা, উত্তম চরিত্র অক্ষুন্ন রাখা। যথা- তোমার সঙ্গে যে আত্মীয় সম্পর্ক রাখতে চায় না তার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা, তোমাকে যে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, তোমাদের প্রতি যে জুলুম করে তাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ، وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ، إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾

আর খারাপের প্রতিদান হলো অনুরূপ খারাপ। অতঃপর যে ক্ষমা করে এবং সমঝোতা ও মিমাংসা করে, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর কেউ অত্যাচারিত হয়ে নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো হলো তাদের বিরূদ্ধে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে ও পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ় চিত্ততার কাজ। *(সূরা আশ শূরা ৪২:৪০-৪৩)*

মন্দ কর্মের প্রকারভেদ [أنواع المنكر]

আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল যে সকল মুনকার তথা অন্যায় কাজের নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরক করা। শিরক হলো আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকা; যথা- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের ইবাদত করা। অথবা পূণ্যবান কোন ব্যক্তি, ফেরেশতাদের থেকে কাউকে বা নাবীদের থেকে কোন নাবীকে, জীন সম্প্রদায়ের কাউকে, উপরোক্ত ব্যক্তি ও বস্তুর মূর্তি, ভাস্কর্য ও তাদের কবরকে আল্লাহর সঙ্গে ডাকা। এ ছাড়াও অন্য কিছু যাদের আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে ডাকা হয়। অথবা তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তার জন্যে সাজদা দেওয়া হয়। এসব ও অনুরূপ বস্তুকে ডাকা শিরকের অন্তভুক্ত, যে শিরককে সকল রসূলের ভাষায় আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে হারাম করেছেন। মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া হারাম; চাই তা লুণ্ঠন, সুদের আদান প্রদান ও জুয়া খেলা বা অন্য যে কোন মাধ্যমে হোক না কেন। যেমন ঐ ব্যবসা ও লেনদেন যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি, কোনো পাপ ও খারাপ কাজ এবং অন্যায় সীমালঙ্ঘন করাকেও আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

অনুরূপভাবে আরো যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, না জেনে আল্লাহর উপর কোন কথা আরোপ করা। যেমন আল্লাহ ও তার রসূলের নামে এমন দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করা; যার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সে জানে না অথবা আল্লাহ তা'আলার এমন সব গুণাবলী বর্ণনা করা যা আল কুরআন ও রসূল আলাইহিস সালাম এর হাদীছ থেকে জানা যায়নি। চাই তা আল্লাহর জন্যে অশোভন গুণাবলী বা আল্লাহকে গুণহীন প্রমাণ করার জন্যে হোক না কেন। যেমন করে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের বলে থাকে, আল্লাহ আরশের উপরও নেই, আসমানের উপরও নেই। আর আল্লাহকে আখেরাতেও দেখা যাবে না, তিনি কথা বলবেন না এবং কাউকে ভালোওবাসেন না। এ ধরনের আরো অনেক কথা যা দ্বারা তারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলকে অস্বীকার করে। অথবা আল্লাহর গুণাবলী প্রমাণ করতে গিয়ে সাদৃশ্য বর্ণনার জন্যে হাদীছ জাল করা। যেমন বর্ণনা করা যে, তিনি জমীনে চলাচল করেন, সৃষ্ট জীবের সঙ্গে বসেন, তাকে প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখা, আসমানসমূহ তাকে বেষ্টন করে ও ঘিরে আছে, তিনি সৃষ্টি জীবের সাথে মিশে গিয়েছেন এরূপ অসংখ্য মিথ্যা রটনা, অপবাদ, মিথ্যাচার আল্লাহর উপর আরোপ করা। অনুরূপভাবে ঐ সব ইবাদত যা নতুন আবিষ্কার (বিদ'আত) করা

হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল শরীয়াতে অনুমোদন করেননি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾

তাদের কি কোন শরীক আছে যারা দীনের বিষয়ে বিধি বিধান প্রণয়ন করবে যে বিষয়ে আল্লাহ কোন অনুমতি প্রদান করেননি। *(সূরা আশ শূরা ৪২:২১)*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দার জন্যে ইবাদতসমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন। সে ইবাদত অকেজো করে দেয়ার জন্যে শয়তান নতুন নতুন ইবাদতসমূহ আবিষ্কার করেছে, শয়তান তাদের জন্যে সে ইবাদতের মতোই আরো কিছু ইবাদত তৈরী করেছে। যথা-আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে শরী'আত নির্ধারিত করেছেন যে, এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কাউকে তার সঙ্গে শরীক করবে না। তারপর শয়তান তাদের জন্যে বহু অংশীদার বিধিবদ্ধ করেছে। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের ইবাদত করা ও তার সঙ্গে শরীক করা। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত, তাতে কুরআন পঠন ও শ্রবণ করা প্রবর্তন করেছেন। তাছাড়া তিনি ছ্বলাতের বাইরে কুরআন শ্রবণের জন্যে একত্রিত হওয়াও অনুমোদন করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি প্রথম যে সূরা অবতীর্ণ করেছেন তাতেও পড়ার কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ﴾

পড় সেই রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। *সূরা আল আলাক ৯৬: ১।*

এ সূরার শুরুতে কিরাত তথা পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শেষে সাজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾

সাজদা কর ও তার নিকটবর্তী হও। *সূরা আল আলাক ৯৬: ১৯*

সেই জন্য ছ্বলাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় যিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। আর সবচেয়ে বড় কাজ হলো এক আল্লাহর জন্যে সাজদায় অবনত হওয়া, যার কোন শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾

আর, ফজরের কুরআন তিলাওয়াত, নিশ্চয় ফজরের কুরআন তিলাওয়াত সাক্ষী হয়। *(সূরা বানী ইসরাইল ১৭:৭৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নিরব থাক যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ অবতীর্ণ করা হয়। *(সূরা আল আরাফ ৭:২০৪)*

রসূল আলাইহিস সালাম এর ছাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন তখন তাদের মধ্যে একজনকে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন, বাকীরা শুনতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতেন, হে আবু মুসা! আমাদের 'রব'-কে আমাদের স্মরণ করিয়ে দাও। তখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন। আর তিনি তা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন। একদা নাবী আলাইহিস সালাম আবু মূসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলেন। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর মনোযোগ সহকারে তার কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

"يا أبا موسى مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك"

হে আবু মুসা, গত রাতে তোমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম আর তুমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলে। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তোমার কুরআন তিলাওয়াত উপভোগ করেছি। আবু মুসা বলেন, আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন তিলাওয়াত উপভোগ করছেন; তাহলে আপনাকে আমি আরো আনন্দিত করতাম। রসূল আলাইহিস সালাম বলেন:

"لله أشد أذنا إلى الرجل يحسن صوته بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته

গায়ক তার গানের প্রতি যেভাবে মনোযোগী হয় আল্লাহ তা'আলা একজন কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি, যে কুরআন সুন্দর আওয়াজ ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে, তার থেকে অধিক মনোযোগী হয়।[৮৯]

---

৮৯. যঈফ: ইবনে মাজাহ ১৩৪০।

মুমিনদের শ্রবণ ও মুশরিকদের শ্রবণের মধ্যে পার্থক্য

[فرق ما بين سماع المؤمنين وسماع المشركين]

এ হলো মুমিনদের শ্রবণ ও পূর্বসূরীদের শ্রবণ ও বড় বড় মাশাইখদের শ্রবণ। যেমন, মা'রূফ আল-কারখী, ফুযাইল ইবনে আয়ায, আবু সুলাইমান আদ-দারানী প্রমুখ। আর অনুরূপ শ্রবণই ছিল পরবর্তী বড় বড় মাশাইখদের। যেমন, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী, শাইখ আদী ইবনে মুসাফির, শাইখ আবী মাদয়ান ও আরো অন্যান্য মাশাইখগণ। পক্ষান্তরে মুশরিকদের শ্রবণ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾

বায়তুল্লাহর নিকট তাদের ছ্বলাত ছিল শিষ ধ্বনি ও হাত তালি। *(সূরা আন-ফাল ৮: ৩৫)*

সালাফগণ বলেন, আল মুকায়া অর্থ শিষ। আর তাসদিয়্যাহ অর্থ করতালি। মুশরিকগণ মাসজিদুল হারামে সমবেত হয়ে হাত তালি ও শিষ ধ্বনি, হুইসেল দিত। আর এটাকেই তারা ইবাদত ও ছ্বলাত হিসাবে গণ্য করত। আল্লাহ তা'আলা এহেন কাজের তীব্র তিরস্কার করেছেন। এ ধরনের বাতিল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ইসলামী গজল শ্রবণ করা, কেবল মাত্র স্ত্রী ও শিশুদের জন্যেই বৈধ। যেমন এ মর্মে আছার (ছাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে আছার বলে) বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোনরূপ সংকীর্ণতা নেই। সুতরাং যারা এ ধরনের শ্রবণকে ইবাদত মনে করে এবং এ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে তারা অবশ্যই তাদের কতক কর্মে অন্ধকারে রয়েছে। এধরনের শ্রবণ রসূল আলাইহিস সালাম যে তিনটি যুগের প্রশংসা করছেন, সে যুগের কোন লোক করেননি এবং বড় বড় মাশাইখদেরও কেউ করেননি।

ছ্বলাত দীনের খুঁটি [الصلاة عماد الدين]

আর দীনের অন্যতম খুঁটি যা ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা হয় না তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছ্বলাত। এর প্রতি অন্যান্য বিধানের তুলনায় অধিক যত্নবান হওয়া মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

উমার ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার কর্মচারীদের প্রতি এ মর্মে চিঠি লিখতেন যে, আমার নিকট আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো ছ্বলাত আদায় করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ছ্বলাতের হিফাযত করল ও যথারীতি পালন করল সে তার দীনকে সংরক্ষণ করল ও দীন কায়েম করল। আর যে এটাকে নষ্ট করল তার পক্ষে অন্যসব কাজ নষ্ট করা অধিকতর সহজ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম ওয়াজিবকৃত ইবাদত হলো পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত। মিরাজের রজনীতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ওয়াজিবকৃত ছ্বলাতের দায়িত্ব পান।

পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্ব মূহুর্তে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সর্বশেষ ছ্বলাতের অছিয়ত করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন।

"الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم"

ছ্বলাতের প্রতি যত্নবান হও! ছ্বলাতের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং তোমাদের কৃতদাসীর প্রতি যত্নবান হও।[৯০]

বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ছ্বলাতের হিসেব নেয়া হবে। ছ্বলাতই হলো সর্বশেষ ইবাদত যা দীন থেকে বের হয়ে যাবে। যখন ছ্বলাত চলে যাবে, তখন পূর্ণাঙ্গ দীনই তার কাছ থেকে চলে যাবে। এটি দীনের মৌলিক খুঁটির অন্যতম। যখনই কারো ছ্বলাত চলে যাবে তখনই তার দীন চলে যাবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"

সকল কর্মের মূল হলো ইসলাম। ইসলামের প্রধান ও মূল খুঁটির অন্যতম হলো ছ্বলাত। আর এর সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।[৯১]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেন:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

---

৯০. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমদ ২৬৪৮৩, আবু দাউদ : ৫১৫৬।
৯১. ছ্বহীহ: আহমাদ : ৫/২৩১, তিরমিযী : ২৬১৬।

তাদের পর আসলো অপদার্থ উত্তরসুরীগণ, যারা ছ্বলাত নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা মারইয়াম ১৯: ৫৯)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নষ্ট করা অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া। আর যদি তারা ছ্বলাত পরিত্যাগ করে তাহলে অবশ্যই কাফির হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة:٢٣٨)

তোমরা ছ্বলাতের হেফাযত কর এবং হেফাযত কর মধ্যবর্তী ছ্বলাতের। *(সূরা আল বাকারা ২: ২৩৮)*

ছ্বলাতের যত্ন নেওয়া হলো সঠিক সময়ে তা সম্পাদন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون:٤-٥)

ঐ সকল ছ্বলাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের ছ্বলাত বিষয়ে উদাসীন। *(সূরা আল মাউন ১০৭: ৪-৫)*

এরা হলো ঐসব লোক যারা ছ্বলাত বিলম্বে আদায় করে অর্থাৎ যখন ছ্বলাতের ওয়াক্ত চলে যায় তখন আদায় করে।

- মুসলিমগণ একমত যে, দিনের ছ্বলাতকে দেরি করে রাতে পড়া জায়েয নেই। অনুরূপভাবে রাতের ছ্বলাত বিলম্ব করে দিনে আদায় করা বৈধ নয়। এটি মুসাফির, অসুস্থ ও মুকিম কারো জন্যেই বৈধ নয়।
- তবে কোন মুসলিমের বিশেষ প্রয়োজনে দিনের ছলাত যুহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে রাতের ছ্বলাত মাগরিব ও এশা এক ওয়াক্তে জমা করে পড়া জায়েয।

  -এটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। তেমনি বর্ষা ও অনুরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায়ও দুই ওয়াক্ত ছলাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন যে, তারা তাদের সাধ্যমত (সময়ে) ছ্বলাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابون:١٦)

তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। *(সূরা আত তাগাবুন ৬৪: ১৬)*

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি তোমাদের যার উপর রেখে যাচ্ছি তার উপর তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পূর্বের যারা ধ্বংস হয়েছে, তার কারণ তারা তাদের নাবীদের বেশী বেশী প্রশ্ন করতো এবং মতবিরোধ করতো। আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করি, তোমরা তা থেকে বিরত থাক। আর আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিই তা সাধ্যমত বাস্তবায়ন কর।[৯২]

পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ তেলাওয়াত, পূর্ণ রুকু ও সাজদাহসহ ছ্বলাত আদায় করা মুসল্লির উপর অপরিহার্য। যদি সে উযূ ভঙ্গকারী অথবা অপবিত্র হয় আর যদি পানি না পায় অথবা পানি পাওয়া সত্ত্বেও সে অসুস্থ, ঠান্ডা ও অনুরূপ কোন কারণে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা বোধ করে, এমতাবস্থায় সে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে। তারপর সে ছ্বলাত আদায় করবে।

উপরোক্ত কারণে আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী ছ্বলাত বিলম্ব করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কারা অন্তরীণ ব্যক্তি, আটক ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্তসহ নানা সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি তাদের অবস্থার আলোকে ছ্বলাত আদায় করবে। আর যদি কেউ শত্রু এলাকায় অবস্থান করে তাহলে সে ছ্বলাতুল খাওফ বা ভয়ের ছ্বলাত আদায় করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

---

৯২. ছ্বহীহ বুখারী : ৭২৮৮।

﴿(١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ (النساء:١٠١-١٠٣)

আর যখন তোমরা ভূপৃষ্টে পর্যটন কর, তখন ছ্বলাত সংক্ষেপ (কসর) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর যখন তুমি তাদের (মুমিনদের) মধ্যে থাকবে, আর তাদের জন্যে (ছ্বলাতে ইমামত করবে) ছ্বলাত প্রতিষ্ঠিত করবে, তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দন্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সিজদাহ সম্পন্ন করবে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা নামায পড়েনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে ছ্বলাত পড়ে এবং স্ব স্ব সতর্কতা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র -শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হবে; এবং তাতে তোমাদের অপরাধ নেই-যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব-স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় সতর্কতা অবলম্বন কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। অনন্তর যখন তোমরা ছ্বলাত সম্পন্ন কর তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন ছ্বলাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ছ্বলাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। *(সূরা আন নিসা ৪: ১০১-১০৩)*

মুসলিম শাসকদের প্রতি সকল পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষকে ছ্বলাত আদায়ের নির্দেশ জারী করা ওয়াজিব। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.(أبو داود)

তোমরা তাদেরকে সাত বছর বয়সে ছ্বলাতের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে সে ছ্বলাত পরিত্যাগ করলে তাকে বেত্রাঘাত কর, আর তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।[৯৩]

ছ্বলাতের পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতের কোন একটি হতে বিরত থাকে অথবা কোন একটি ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করে, তাহলে মুসলিম উম্মাহ এ মর্মে একমত যে, তার উপর ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত কর্তৃক ইসলামে ফিরে আসার সমন জারী হবে। যদি সে তওবা করতঃ স্বদীনে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।

---

৯৩. হাসান, ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৯৪।

উক্ত উলামাদের মধ্যে কেউ বলেন, ছ্বলাত পরিত্যাগকারী দীনচ্যুত কাফির। তার জানাযার ছ্বলাত আদায় করা যাবে না এবং মুসলিমদের কবর স্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না। কেউ বলেন, ইচ্ছাকৃত ছ্বলাত ত্যাগকারী ডাকাত, হত্যাকারী ও বিবাহিত জিনাকারীর ন্যায় হত্যা যোগ্য অপরাধী হবে।

ছ্বলাত হলো মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার মর্যাদাও সর্বাধিক। তাই ছ্বলাত পরিত্যাগকারীর শাস্তিও উপরোক্ত শাস্তির চেয়েও ভয়াবহ। কেননা ছ্বলাত হলো দীনের স্তম্ভ ও খুঁটি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে সকল ইবাদতের উপর ছ্বলাতের গুরুত্ব ও মহত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কখনো তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কখনো যাকাত, সবর, কুরবানী প্রভৃতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যথা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة:٤٣)

আর তোমরা ছ্বলাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। *(সূরা আল বাকারা ২: ৪৩)*

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَاسْتَعِيْنُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ (البقرة:٤٥)

তোমরা ধৈর্য ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। এটি বড়ই কঠিন; তবে বিনয়ী ব্যক্তিদের কথা আলাদা। *(সূরা আল বাকারা ২: ৪৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر:٢)

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশ্যে ছ্বলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। *সূরা আল কাউসার ১০৮: ২।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)﴾ (الأنعام ٦ :١٦٢-١٦٣)

বল, নিশ্চয় আমার ছ্বলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের রব আল্লাহ্‌র জন্য। তার কোন শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম। *(সূরা আল আন'আম ৬:১৬২-১৬৩)*

আর কখনো ভালো আমল দ্বারা শুরু করেছেন এবং ছ্বলাত দ্বারা সমাপনী করেছেন। যেমন, সূরা মা'আরিজ এ বর্ণিত হয়েছে:

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٦) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٧) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)﴾ (المعارج:١-٢٣)

এক ব্যক্তি জানতে চাইল সে আযাব সম্পর্কে যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কাফিরদের জন্য তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। সে শাস্তি আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি (উচ্চ মর্যাদার অধিকারী) উর্ধ্ব গমনের পথগুলোর মালিক। ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। সুতরাং (হে নাবী) ধৈর্য ধারণ করুন সুন্দর ও উত্তম ভাবে। তারা সে দিনটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি তা নিকটে দেখতে পাচ্ছি। সে দিন আকাশ হবে গলিত রূপার মতো, আর পাহাড়গুলো হবে রঙ্গিন পশমের মতো। সে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খবর নিবে না, যদিও তাদেরকে মুখোমুখী দৃষ্টির সম্মুখে রাখা হবে, সে দিন অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে বাঁচার জন্য বিনিময়ে তার সন্তানকে দিতে চাইবে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, আর তার আত্মীয় স্বজনদের যারা তাকে আশ্রয় দিত। এমনকি পৃথিবীর সকলকে, যাতে তা (উক্ত আযাব) থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। না, কক্ষনো নয়, ওটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যা চামড়া তুলে দিবে, জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে পেছনে ফিরে গিয়েছিল (আল্লাহর হুকুম থেকে) এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে সম্পদ জমা করত, অতঃপর তা আগলে রাখত। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই অস্থির মনা করে, বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে উৎকণ্ঠিত হয়, কল্যাণ তাকে স্পর্শ করলে সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ, তবে ছ্বলাত আদায়কারীরা এমন নয়। যারা তাদের ছ্বলাতে স্থির সংকল্প। *(সূরা আল মা'আরিজ ৭০: ১ - ২৩)*

সূরা মুমিনুনের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ

لأَ÷مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ، الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ (المؤمنون:١-١١)

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের ছ্বলাতে। যারা অসার কার্য-কলাপ হতে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। আর যারা নিজেদের ছ্বলাতে যত্নবান থাকে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। *(সূরা আল মু'মিনুন ২৩: ১-১১ আয়াত)*

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন এর বিনিময়ে আমাকে ও আপনাদেরকে ঐ সকল ব্যক্তিদের ওয়ারিস করেন যারা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তিনি যেন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা আমার, আপনাদের ও সকল মুমিন ভাইদের আমলনামা সমৃদ্ধ করেন।

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَه". وَصَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ, وَصَحْبِهِ, وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকতের ধারা বর্ষিত হোক। সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্যে। আমাদের নাবী মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার বংশধর ও সহচরদের প্রতি শান্তি ও অফুরন্ত রহমত অবতীর্ণ হোক। আমীন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত/পিডিএফ বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায

২. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু

৩. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ

৪. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী

৫. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৬. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৭. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৮. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

৯. আল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

১০. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১১. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১২. আল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১৩. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৪. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৫. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৭. একশত কাবীরা গুনাহ-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

১৮. খিলাফাত ও বাই‘আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২০. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম

২১. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

২২. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৪. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৫. ফিক্বহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৬. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৭. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

২৮. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির

৩০. আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৩১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানক্বীতী

৩২. তাইসীরুল ‘আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)

- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্‌সাম